বিশ্ব হিন্দু বার্তা

মূল্য ঃ ১০ টাকা

কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্যম্
ॐ
ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ

৪৭ তম বর্ষ
পৌষ ১৪২৮ • পঞ্চম সংখ্যা

- অযোধ্যায় অনুষ্ঠিত দুর্গা বাহিনীর অখিল ভারতীয় অভ্যাস বর্গ(উপরে)
- তারাপুরে নিঃশুল্ক স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির (নীচে)

কল্যাণ বাণী

সর্বং পরবশং দুঃখং সর্বম্ আত্মবশং সুখম্। এতদ্বিদ্যাৎ সমাসেন লক্ষণং সুখদুঃখয়োঃ।। (মনুস্মৃতি ৪/১৬০)

পরাধীনতাই দুঃখ এবং স্বাধীনতাই সুখ। সুখদুঃখের এই সংক্ষেপ লক্ষণ জানিবে।

সম্পাদকীয়...

সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের এক শিবিরে পরম পূজনীয় সরসঙ্ঘচালক মন্তব্য করিয়াছেন যে ভারতভূমির বিভাজনের মূল কারণ হইল ভারতবাসীর একাংশের ভাবের পরিবর্তন। হিন্দুকে যদি হিন্দু থাকিতে হয় তাহা হইলে ভারত বিভাজন রদ হওয়া আবশ্যক। স্বভাবতই সরসঙ্ঘচালকের এই বিবৃতি লইয়া হিন্দু সমাজে বিশেষ প্রতিক্রিয়া হইয়াছে। আগামী ২০২২ এ ক্ষমতার হস্তান্তরের ৭৫ বর্ষপূর্তি। অতএব তাহার প্রাক্কালে এই প্রসঙ্গ যথেষ্ট আলোচনার দাবি রাখে।

১৯৪৭ এর ভারত বিভাজন ও ক্ষমতার হস্তান্তর (আংশিক) হিন্দুর ইতিহাসের এক বিরাট বেদনাময় অধ্যায়। এই বিভাজনের দ্বারা ভারতভূমির এক চতুর্থাংশ ভূমি লইয়া ১৯৪৭ এ পাকিস্তান সৃষ্টি হয়। 'পাক' স্থান অর্থাল 'পবিত্র ভূমি'-যাহা পৌত্তলিকতার অভিশাপ হইতে মুক্ত। অতএব উৎপত্তির অব্যবহিত পরেই তথা হইতে হিন্দু বিতাড়ন একপ্রকার সম্পূর্ণ হয়। পশ্চিম পঞ্জাব, সিন্ধু প্রদেশে হিন্দু নির্মূলীকৃত হওয়ায় দেবালয়গুলি পরিত্যক্ত হয়, পূজার্চনা বন্ধ হইয়া যায় ও বিতাড়িত হিন্দুকে 'শত্রু' আখ্যায়িত করিয়া তাহার পড়িয়া থাকা সম্পত্তি স্থানীয় তৌহিদী সম্প্রদায় অথবা রাষ্ট্র অধিকার করিয়া লয়।

দুঃখের বিষয় যে পাকিস্তান ছাড়িয়া যে অবশিষ্ট ভারতভূমিকে হিন্দুরা নিজস্ব ও নিরুপদ্রব বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তথায়ও যে হিন্দু বাস্তবে একপ্রকার 'জিম্মি' (অধিকৃত) ও তৃতীয় শ্রেণির নাগরিক তাহা ১৯৪৭ এ হিন্দুরা অনুমান করিতে পারে নাই ও অদ্যপি তাহারা ইহা অনুধাবন করে না। উত্তর ঔপনিবেশিক অবশিষ্ট ভারতে হিন্দুকে যে প্রকাশ্য ও গোপন শর্তগুলি মানিয়া লইতে হয়,তাহা হইল, প্রথমত তাহারা নিজেদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ধর্মশিক্ষা দিতে পারিবে না। দ্বিতীয়ত তাহারা নিজেদের রূপান্তরিত দেবালয়গুলি পুনরুদ্ধার করিতে পারিবে না। তৃতীয়ত দেবালয়গুলিতে জমা পড়া প্রণামী ও দানের অর্থ হিন্দুর কল্যাণে ব্যবহৃত হইতে পারিবে না। ইহা অধিকার করিবে সরকার। চতুর্থত কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুসলমান ও খ্রিস্টানের নিপীড়ন ও শোষণ বিষয়ে চর্চা করা যাইবে না। পঞ্চমত হিন্দুরা একাধিক বিবাহ করিলে সাত বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড হইবে। ষষ্ঠম তাহারা গোহত্যা ও গোমাংসাহার রদ করিতে পারিবে না। সপ্তমত ঔপনিবেশিক ভারতে কর্মরত সকল ব্রিটিশ নাগরিক ও ব্রিটিশ সরকারের বেতনভোগী সকল কর্মচারীকে ভারত সরকার পূর্বের ন্যায় বেতন ও ভাতা দিবেন । অষ্টমত সশস্ত্র বিপ্লবী ও আজাদ হিন্দ বাহিনীর কাহাকেও উত্তর ঔপনিবেশিক ভারত সরকারে গুরুত্বপূর্ণ পদ দেওয়া যাইবে না। নবমত সুভাষচন্দ্র বসু যুদ্ধাপরাধী। তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া গেলে মিত্রপক্ষের হস্তে সমর্পণ করতে হইবে ও দশমত অহিংস আন্দোলনকেই ঔপনিবেশিক শাসনের পরিবর্তনের মূল কারণ অথবা উত্তরাধিকারী বলিয়া ধার্য করিতে হইবে ও এই আন্দোলনের সহিত যুক্তরাই উত্তর ঔপনিবেশিক অবশিষ্ট ভারতের শাসনকার্য চালাইবেন।

ব্রিটিশ শাসনকে দৈব আশীর্বাদ বলিয়া মনে করিতেন রামমোহন। জাতির জনকও ভারতের উন্নতি ও আধুনিকতার জন্য ইংরাজের নিকট ভারতবাসীর কৃতজ্ঞ থাকা উচিৎ বলিয়া মনে করিতেন। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তিনি হিন্দু যুবকদের ব্রিটিশের পক্ষে যোগদান করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই দুই বিশ্বযুদ্ধে যত সংখ্যক হিন্দু ব্রিটিশের পক্ষ লইয়া যুদ্ধ করিয়াছিল তত সংখ্যক ইউরোপবাসীও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নাই। ক্ষমতার হস্তান্তরের পরে ভারতের পতাকার একাংশে ব্রিটেনের পতাকা রাখিবার পক্ষপাতী ছিলেন জাতির জনক।

অতএব উত্তর ঔপনিবেশিক দক্ষিণ এশিয়ার বিগত ৭৪ বৎসরের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে ইহা স্পষ্ট হইয়া যায় যে তাহার প্রতিটি অংশেই হিন্দু অবদমিত ও ক্ষীয়মান। এই অবস্থায় উপমহাদেশের সংযুক্তির অর্থ হিন্দুর সংখ্যাগরিষ্ঠতা একপ্রকার লোপ পাওয়া। উপমহাদেশের সংবিধান, শিক্ষা, বিচারব্যবস্থা, বিনোদন সকলই পৌত্তলিক হিন্দুবিরোধী। স্থানীয় সরকার, পুলিশ, প্রশাসন ইত্যাদিও হিন্দুবিরোধী হইয়া উঠিলে সমগ্র দক্ষিণ এশিয়া ক্রমশঃ পৌত্তলিকতার অভিশাপ হইতে মুক্ত হইবে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ইহাই হিন্দুবিরোধীর অভীষ্ট।

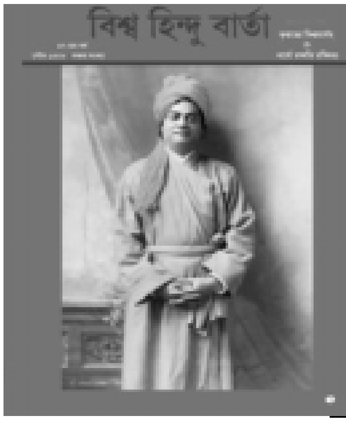

বিশ্ব হিন্দু বার্তা

কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্যম্

ওঁ

ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ

৪৭ তম বর্ষ * পৌষ ১৪২৮ * পঞ্চম সংখ্যা

স ম্পা দ ক ম ণ্ড লী

মুখ্য উপদেষ্টা ঃ শ্রী সত্যরঞ্জন গিরি

সম্পাদক ও প্রকাশক ঃ শ্রী পীতারুণ মুখোপাধ্যায়

৩৩, ভূপেন বোস এভিনিউ, কলকাতা -৪

দূরভাষ ঃ ২৫৫৫-৪২৩১, ২৫৫৫-৩৫৮৮

Website : www.vhpbengal.org
www.vhp.org/publication

E-mail : vishvahindu1964@gmail.com
vishvahinduvarta@yahoo.com

প্রতি সংখ্যার মূল্য	বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা	আজীবন গ্রাহক চাঁদা	ডাক মাশুল
১০ টাকা	১১০ টাকা	১৫০০ টাকা	নিঃশুল্ক

‘বিশ্ব হিন্দু বার্তা’-র গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলি

যাঁরা ‘বিশ্ব হিন্দু বার্তা’-র গ্রাহক হতে চান তাঁরা সরাসরি বিশ্ব হিন্দু বার্তার কার্যালয়ে বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ‘মানি অর্ডার’ অথবা ‘চেক/ ড্রাফ্ট’ মাধ্যমে পাঠিয়ে বার্ষিক গ্রাহক অথবা আজীবন গ্রাহক হতে পারেন। চেক/ড্রাফ্ট পাঠালে **'VISHVA HINDU VARTA'** এই নামে নীচের ঠিকানায় পাঠাবেন। ২৫ কপির নীচে এজেন্সি দেওয়া হয় না।

VISHVA HINDU VARTA
33,Bhupen Bose Avenue
Kolkata-700004, West Bengal

যাঁরা অ্যাকাউন্ট টু অ্যাকাউন্ট টাকা ট্রান্সফার করে গ্রাহক হবেন তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে ফোন করে নিজেদের নাম, ঠিকানা, অ্যাকাউন্ট নং, ট্রানস্‌অ্যাকশন নং ও কোন মাস থেকে গ্রাহক হতে চান তা অবশ্যই জানিয়ে দেবেন।

Phone : 2555-4231/3588

VISHVA HINDU VARTA
Punjab National Bank A/c. No. : 11830102690
IFSC : PUNB0118320, MICR : 700023425
Shyambazar Market Evening Branch

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি (সাধারণ সংখ্যা)

Back Cover Page - Rs.20,000/-
Inside Front or Back Cover Page - Rs.10,000/-
Inside Full Page Rs.6000/- ● Half Page Rs.3000/-

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ঃ
দূরভাষ ঃ ২৫৫৫-৪২৩১, ২৫৫৫-৩৫৮৮

●লেখকদের প্রতি

১) প্রতি ইংরেজি মাসের ৩০ তারিখের মধ্যে লেখা পাঠান।
২) সাদা পৃষ্ঠায় মার্জিন ছেড়ে উল্টো পৃষ্ঠা খালি রেখে লিখবেন। DTP করে পাঠালেও চলবে।
৩) ছবি ও প্রতিবেদন E-mail কিংবা WhatsApp-এর মাধ্যমে পাঠাতে পারেন।

সূ চি প ত্র

■ **স্বামী বিবেকানন্দ ও হিন্দুত্ব** *রামানুজ গোস্বামী* ৫
■ **অসভ্য ভারতীয়রা তৈরি করেছিল এত বড় সভ্যতা** *সুদীপ নারায়ণ ঘোষ* ৯
■ **ডঃ আম্বেদকরের চোখে হিন্দু মুসলমানের সমস্যা** *প্রণব দত্ত মজুমদার* ১৩
■ **মাস্টারদা সূর্য সেন ঃ পরাধীন ভারতবর্ষের এক বিপ্লবী মহাজীবন** *অহিন রায়চৌধুরী* ১৮
■ **কাবা হিন্দু মন্দির কেন ধ্বংস হল** *অমলেশ মিশ্র* ২১
■ **রামমন্দির সচেতন সমাজেরও প্রতীক** *সৌগত বসু* ২৪
■ **প্রেসবার্তা ঃ সামাজিক সমরসতা বিভাগ** ২৬
■ **পরিষদ বার্তা** ২৮ ■ **শোক বার্তা** ২৮
■ **রাজ্য বার্তা** ২৯ ■ **রাষ্ট্র বার্তা** ২৯ ■ **বিশ্ব বার্তা** ৩৩

স্বামী বিবেকানন্দ ও হিন্দুত্ব

রামানুজ গোস্বামী

স্বামী বিবেকানন্দ-নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ শ্রদ্ধায় অবনত হয়। তাঁর জন্মদিবস যুবদিবস নামে পালিতও হয়ে থাকে। এটা ঠিকই যে, বিবেকানন্দের প্রতি বিশেষতঃ হিন্দুদের রয়েছে যথেষ্টই শ্রদ্ধা ও ভক্তিভাব। কিন্তু, পাশাপাশি এটাও বলা অবশ্যই দরকার যে, **স্বামীজিকে নিয়ে রয়েছে যথেষ্ট অজ্ঞতা, চর্চার অভাব এবং যথার্থ উপলব্ধির সীমাবদ্ধতা।** এই তিনটি কারণের জন্য যে মূল কারণটি দায়ী, তা হল রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি, সুকৌশলী বুদ্ধিজীবীদের স্বার্থন্বেষী মানসিকতা এবং হিন্দুদের এক বিরাট অংশের নিজস্ব ধর্ম, শাস্ত্রগ্রন্থ, হিন্দুত্বের ইতিহাস ইত্যাদি প্রসঙ্গে জানার অনীহা। ঠিক এই সব কারণেই তথাকথিত প্রগতিশীল উচ্চশিক্ষিত হিন্দুদের কাছে স্বামীজি একজন হিন্দুত্ববাদী সন্ন্যাসী নন, তিনি একজন মানবতাবাদী ধর্মের প্রচারক। এই কথার অর্থ হয় দুই রকম; **যেন, মানবধর্ম নামের কোনো ধর্মমত প্রবর্তন করেছিলেন স্বামীজি এবং জন্মসূত্রে হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও (এবং তাঁর গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে একজন হিন্দু ব্রাহ্মণ ও মা কালীর মন্দিরের পূজারি হওয়া সত্ত্বেও) তিনি হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে ওই মানবধর্ম বা মানবতাবাদী ধর্ম প্রবর্তন করেন। এর অপর অর্থ যে, হিন্দু ধর্ম মানবতাবাদী নয়। এই ধর্মে মানবতাবাদের কোনোই স্থান নেই।** বলাই বাহুল্য যে, এই দুই অর্থই অবান্তর ও হাস্যকর। স্বামীজীর বহু রচনা ও বক্তব্যে বারে বারেই উঠে এসেছে যে, হিন্দু হওয়াটাই একটা অতি গর্বের ব্যাপার। কারণ, অন্যান্য ধর্মের ক্ষেত্রে ধর্মাচার্যগণ নিজেদের কোনো প্রাচীন সম্রাটের বংশধর বলে দাবি করেন। কিন্তু, এক্ষেত্রে অর্থাৎ এই দেশে হিন্দু ধর্মের বড় বড় সম্রাটরা নিজেদের কোনো প্রাচীন ঋষির বংশধর বলে প্রমাণ করবার মরিয়া চেষ্টা করে থাকেন। এটাই হিন্দু ধর্মের বৈশিষ্ট্য। এখানেই হিন্দুধর্মের স্বতন্ত্রতা ও শ্রেষ্ঠত্ব।

স্বামীজির রচনাবলী গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে দেখা যায় যে, বহু ক্ষেত্রে, বারে বারে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন যে একজন কট্টর হিন্দুত্ববাদী বলতে আধুনিককালে যা বোঝায়, তিনি সব অর্থেই তাই ছিলেন এবং দেশ তথা সমাজের প্রকৃত কল্যাণের জন্য তিনি প্রাচীন আর্য ধর্ম তথা হিন্দুধর্মের ঐতিহ্য ও পরম্পরার প্রচারের উপরেই গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।

অথচ এই সকল ব্যাপারে স্বামীজি যেন কখনও কিছুই বলেননি, এমন একটা ভাবধারা স্বার্থান্বেষীরা প্রচার করেছে। বস্তুতঃ স্বামীজির বাণী ও রচনা পড়লে এটা বোঝাই যায় যে, হিন্দুদের তিনি কীভাবে হিন্দুত্ববাদী ভাবনা ও ঐতিহ্যের প্রচার ও প্রসারে উৎসাহিত করেছেন। বারে বারে তাঁর কথায় বা লেখায় এটাই উঠে এসেছে যে, এই দেশের প্রাণকেন্দ্রই হল ধর্ম এবং তা অবশ্যই সনাতন ধর্ম বা হিন্দুধর্ম। তাই অন্যান্য ক্ষেত্রের উন্নতি পরে হলেও চলবে, কিন্তু আধ্যাত্মিক উন্নতি বা ধর্মীয় উন্নতি তথা হিন্দুত্বের প্রসার সর্বাগ্রে দরকার। এই প্রসঙ্গে স্বামীজির রচনাবলী থেকেই উদ্ধৃত করা যায়-"**তোমরা যদি ধর্ম ছাড়িয়া দিয়া পাশ্চাত্যজাতির জড়বাদ-সর্বস্ব সভ্যতার অভিমুখে ধাবিত হও, তোমরা তিনপুরুষ যাইতে না যাইতেই বিনষ্ট হইবে। ধর্ম ছাড়িয়া দিলে হিন্দুর জাতীয় মেরুদণ্ডই ভাঙিয়া যাইবে—যে ভিত্তির উপর জাতীয় সুবিশাল সৌধ নির্মিত হইয়াছিল, তাহাই ভাঙিয়া যাইবে; ফল দাঁড়াইবে— সম্পূর্ণ ধ্বংস।" (স্বামীজীর বাণী ও রচনা ঃ ৫।৪৬)**

সুতরাং এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, কী ভাবে হিন্দুদের নিজেদের ধর্মরক্ষার ক্ষেত্রে উৎসাহিত করতে চেয়েছিলেন স্বামীজি। হিন্দরা যাতে নিজেদের গৌরবময় অতীত, ঐতিহ্য, হিন্দু সম্রাটদের শাসনকালের বিস্তারিত বিবরণ, হিন্দু ধর্ম কীভাবে সারা পৃথিবীতে প্রভাব বিস্তার করেছিল, ভারতের প্রাচীন মুনি-ঋষিরা কীভাবে পরম উপলব্ধিতে সমর্থ হয়েছিলেন, বেদ-উপনিষদের মূল বক্তব্যই বা কী —এই সব নানা ব্যাপারে আগ্রহী হয় এবং যাতে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিপুলভাবে প্রচার চালানো যায়, হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে যাতে এই সব ব্যাপারে গড়ে ওঠে জনভিত্তি, স্বামীজি সেটাই চেয়েছিলেন। তাই তাঁর বক্তব্য এই ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য—। "**আমাদের ধর্মই**

আমাদের সম্মিলনভূমি, ওই ভিত্তিতেই আমাদিগকে জাতীয় জীবন গঠন করিতে হইবে। ভাবী ভারত গঠনে হিন্দুধর্মের ঐক্যসাধন অনিবার্য রূপে প্রয়োজন।" (৫।১৮৩)

তিনি আরও বলেছেন যে—"প্রথমেই আমাদিগকে এই কাজে মন দিতে হইবে যে, আমাদের উপনিষদে, আমাদের পুরাণে, আমাদের অন্যান্য শাস্ত্রে যে সকল অপূর্ব সত্য নিহিত আছে সেগুলি ঐ সকল গ্রন্থ হইতে, মঠ হইতে, অরণ্য হইতে, সম্প্রদায় বিশেষের অধিকার হইতে বাহির করিয়া সমগ্র ভারতভূমিতে ছড়াইতে হইবে, যেন ঐ সকল শাস্ত্রনিহিত সত্য আগুনের মত উত্তর হইতে দক্ষিণ, পূর্ব হইতে পশ্চিম, হিমালয় হইতে কুমারিকা, সিন্ধু হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত সারাদেশে ছুটিতে থাকে।" (৫।১১১)

স্বামীজির মতে—"আমাদিগকে দেখিতে হইবে কীরূপে, এই বেদান্ত আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে, নাগরিক জীবনে, গ্রাম্য জীবনে, প্রত্যেক জাতির জীবনে—প্রত্যেক জাতির গার্হস্থ্য জীবনে কার্যে পরিণত করিতে পারা যায়।" (২।২২৯)

স্বামী বিবেকানন্দ এটাই চেয়েছিলেন যে, ভারতবাসী বর্ণাশ্রম ধর্মের আদর্শকে অনুসরণ করে প্রাচীন ঋষিদের প্রদর্শিত পথ ধরেই উন্নতির দিকে এগিয়ে যাক। তিনি এই বৈদান্তিকতার প্রচারে যুবসমাজকে বিশেষ ভাবে আহ্বান জানিয়েছেন। হিন্দু যুবকেরা দেশে-বিদেশে সর্বত্র বেদান্ত প্রচার করুক, এটাই ছিল তাঁর ভাবনা। হিন্দু সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ ঘুচিয়ে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বানও জানিয়েছেন স্বামীজি। বস্তুতঃ নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ যে হিন্দুসমাজের বিপত্তির একটা খুব বড় কারণ, এটা স্বামীজি বারে বারেই উল্লেখ করেছেন। এই ব্যাপারে তিনি সঙ্ঘ-স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেছেন যা হিন্দুদের নানা সম্প্রদায়ের পরস্পর পরস্পরকে সহায়তা ও মতামত আদান-প্রদানে শিক্ষা-প্রদান করবে।

বর্তমানকালে অনেক শিক্ষাবিদ ও দার্শনিক ভারতীয় ধারায় শিক্ষাদানের পক্ষে সওয়াল করেছেন। এই ব্যাপারেও যুগদ্রষ্টা স্বামীজির উক্তি সত্যিই অবিশ্বাস্য। স্বামীজি বলেছেন যে—"আমাদিগকে বিদেশে যাইতে হইবে, আধ্যাত্মিকতা ও দার্শনিক চিন্তার দ্বারা আমাদিগকে পৃথিবী জয় করিতে হইবে, এ ছাড়া আর গত্যন্তর নাই।... জাতীয় জীবনকে—যে জাতীয় জীবন একদিন সতেজ ছিল তাহাকে পুনরায় সতেজ করিতে গেলে ভারতীয় চিন্তারাশি দ্বারা পৃথিবী জয় করিতে হইবে।" (৫।১৭২)

বলাই বাহুল্য যে, বিবেকানন্দের ভাবনায় প্রাচীন হিন্দু আদর্শ, হিন্দু মতবাদ, ঐতিহ্য ও পরম্পরার বিস্তার এবং গুরুকুলপ্রথাই প্রকৃত বিদ্বান মানুষ গঠন করতে পারে। তাই তিনি আবারও নতুন করে ওই ধরণের শিক্ষা-ব্যবস্থারই পত্তন করতে চেয়েছিলেন।

এটা ঠিক যে, স্বামীজি অবশ্যই পাশ্চাত্যের আধুনিক প্রযুক্তি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চাকে গ্রহণ করবার কথা বলেছেন—তবে তা অবশ্যই ভারতের সনাতন ধর্মীয় আদর্শকে বাদ দিয়ে নয়। ধর্মই যে সমাজের ভিত্তি, তা যে স্বামীজি কতবার কতভাবে কতস্থানে বলেছেন, তার ইয়ত্তা করা যায় না। এই প্রসঙ্গে দুইটি উক্তির কথা অবশ্যই বলা দরকার—"ভারত চিরকাল মাথায় জুতো বইবে, যদি ত্যাগী সন্ন্যাসীদের হাতে আবার ভারতকে বিদ্যা শেখাবার ভার না পড়ে।" (৯।৪০৪)

"ছোট ছেলেদের পড়বার উপযুক্ত একখানাও কেতাব নেই। ....রামায়ণ, মহাভারত, উপনিষদ্ থেকে ছোট ছোট গল্প নিয়ে অতি সোজা ভাষায় কতকগুলি বাঙলাতে কতকগুলি ইংরেজীতে কেতাব করা চাই। সেগুলি ছোটছেলেদের পড়াতে হবে।" (৯।৪০৫)

—বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে তথাকথিত বিবেকানন্দভক্তেরা যখন নানাবিধ অশালীন মন্তব্য করে হিন্দু সন্ন্যাসী, হিন্দু পৌরাণিক চরিত্র সম্পর্কে, তখন সেইসব উক্তির বিরুদ্ধে স্বামীজির এইসকল মন্তব্য যেন এক-একটি নির্মল কশাঘাত। অন্যান্য ধর্মের লোকেদের কথা বাদ দিলেও হিন্দু সমাজের মধ্যে থেকেও যারা হিন্দুত্বকেই অপমান করে চলেছে প্রতিনিয়ত এবং জয়গান করছে বিধর্মীদের, সেই সব বিশ্বাসঘাতক ও ধান্দাজীবীদের একেবারেই ঘৃণা করতেন স্বামী বিবেকানন্দ। এটা নয় যে, তিনি হিন্দু ব্যতীত সকল ধর্মকেই ঘৃণা করবার কথা বলেছেন। কিন্তু, যারা সনাতন হিন্দু ধর্মকে অপমান করবার কথা ভেবেছে বা করেছে—তাদের বিরুদ্ধে সদাসর্বদাই খড়্গহস্ত হয়েছেন বিবেকানন্দ। এই প্রসঙ্গে স্বামীজির অসংখ্য উক্তি রয়েছে। সীমিত পরিসরে আমরা তার মধ্যে কয়েকখানি উক্তি এই ক্ষেত্রে উল্লেখ করছি—

"নৈতিক আদর্শের দিক দিয়া হিন্দুরা অন্যান্য সকল জাতি অপেক্ষা প্রভূত উন্নততর।" (১০।৩৪)

"যদি বিভিন্ন দেশের ইতিহাস তুলনা করা যায় তবে দেখা যাইবে, এই সহিষ্ণু নিরীহ হিন্দুজাতির নিকট পৃথিবী যতটা ঋণী, আর কোন জাতিরই নিকট ততটা নহে। ... হিন্দুগণ চিরকালই ঈশ্বরের মহিমান্বিত সন্তান। ..... পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে কেবল আমরাই কখনও অপর জাতিকে যুদ্ধ বিগ্রহের দ্বারা জয় করি নাই।" (৫।৪)

"হিন্দুদিগের সকল দোষত্রুটি থাকা সত্ত্বেও তাহারা নৈতিক চরিত্রে ও আধ্যাত্মিকতায় অন্যান্য জাতি অপেক্ষা বহু উর্ধ্বে।" (৬।৪৯৬)

"জগতে যত জাতি আছে, তাহার মধ্যে হিন্দুই সর্বাপেক্ষা

পরধর্মসহিষ্ণু।..... ভারতে মুসলমানেরাই প্রথমে পরমধর্মাবলম্বীর বিরুদ্ধে তরবারি গ্রহণ করিয়াছিল।" (৯।৪৪৭)

"সনাতন হিন্দুধর্মের জয় হোক্! মিথ্যাবাদী ও পাষণ্ডেরা পরাভূত হোক্। উঠ, উঠ বৎসগণ, আমরা নিশ্চিত জয়লাভ করব।" (৬।৪১৯)

"মিশনারীরা ভারতে গিয়া শুধু দুইটি কাজ করেন—যথা দেশবাসীর পবিত্র-তম বিশ্বাসসমূহের নিন্দা করা এবং জনগণের নীতি ও ধর্মবোধকে শিথিল করিয়া দেওয়া।" (১০।১৫)

"তোমরা কতকগুলি মানুষকে শিক্ষিত কর, খেতে দাও, পরতে দাও, মাইনে দাও—কী কাজের জন্য? তারা আমার দেশে এসে আমার পূর্বপুরুষদেব অভিসম্পাত করে, আমার ধর্মকে গাল দেয়, আমার দেশের সব কিছুকে মন্দ বলে। তারা মন্দিরের ধার দিয়ে যেতে যেতে বলে, এই পৌত্তলিকের দল, তোরা নরকে যাবি। তারা কিন্তু মুসলমানদের একটি কথাও বলতে সাহস করে না, জানে—এখনি খাপ থেকে তলোয়ার বেরিয়ে পড়বে।" (৫।৪১৬)

"তোমরা কতকগুলি মানুষকে শিক্ষিত কর, খেতে দাও, পরতে দাও, মাইনে দাও—কী কাজের জন্য? তারা আমার দেশে এসে আমার পূর্বপুরুষদের অভিসম্পাত করে, আমার ধর্মকে গাল দেয়, আমার দেশের সব কিছুকে মন্দ বলে। তারা মন্দিরের ধার দিয়ে যেতে যেতে বলে, এই পৌত্তলিকের দল, তোরা নরকে যাবি। তারা কিন্তু মুসলমানদের একটি কথাও বলতে সাহস করে না, জানে—এখনি খাপ থেকে তলোয়ার বেরিয়ে পড়বে।"

"হিন্দু ধর্ম কখনও অপর ধর্মাবলম্বীদের উপর উত্যাচার করে নাই। আমাদের দেশে সকল সম্প্রদায়ই প্রেম ও শান্তিতে বাস করিতে পারে। মুসলমানদের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতে ধর্মসম্বন্ধীয় মতামত লইয়া হত্যা অত্যাচার প্রভৃতি প্রবেশ করিয়াছে, তাহারা আসিবার পূর্ব পর্যন্ত ভারতে আধ্যাত্মিক রাজ্যে শান্তি বিরাজিত ছিল।" (৯।৪৩৯)

"খ্রীষ্টধর্ম চিরকালই তরবারির বলে প্রচারিত হয়েছে।" (৪।২৫০)

"এখন লক্ষ্যণীয় যে, মুসলমানরা এই বিষয়ে সর্বাপেক্ষা অপরিণত ও সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন। তাঁহাদের মূল মন্ত্র আল্লা এক এবং মহম্মদই একমাত্র পয়গম্বর। যাহা কিছু ইহার বহির্ভূত সে সমস্ত কেবল খারাপই নহে উপরন্তু সে সমস্তই তৎক্ষণাৎ ধ্বংস করিতে হইবে; যে কোন পুরুষ বা নারী এই মতে সামান্য অবিশ্বাসী তাহাকেই নিমেষে হত্যা করিতে হইবে; যাহা কিছু এই উপাসনা পদ্ধতির বহির্ভূত তাহাকেই অবিলম্বে ভাঙিয়া ফেলিতে হইবে; যে কোন গ্রন্থে অন্যরূপ মত প্রচারিত হইয়াছে সেগুলি দগ্ধ করিতে হইবে। প্রশান্ত মহাসাগর হইতে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত ব্যাপক এলাকায় দীর্ঘ পাঁচশত বৎসর ধরিয়া পৃথিবীতে রক্তের বন্যা বহিয়া গিয়াছে। ইহাই মুসলমান ধর্ম।

(Complete Works, Eng. Vol- IV, p. 125-126)

স্বামীজী স্পষ্ট ভাষায় এই বলে আমাদের সতর্ক করেছেন যে—"মুসলমানগণ যখন ভারতবর্ষে প্রথম আসে, তখন ভারতে এখনকার অপেক্ষা কত বেশী হিন্দুর বসবাস ছিল, আজ তাহাদের সংখ্যা কত হ্রাস পাইয়াছে। ইহার কোন প্রতিকার না হইলে হিন্দু দিন দিন আরও কমিয়া যাইবে, শেষে আর কেহ হিন্দু থাকিবে না।" (৫।৩৪০)

স্বামীজী আরো বলেছেন যে—"শত শত বৎসর ধরিয়া 'আল্লা হো আকবর' রবে ভারতবর্ষ মুখরিত হইয়াছে এবং এমন হিন্দু কেহ ছিল না, যে প্রতিমুহূর্তে নিজের জীবন বিনাশ আশঙ্কা না করিয়াছে।" (৫।২৭১)

—বস্তুতঃ ইসলাম যে মোটেও কোনো শান্তির ধর্ম নয় এবং অন্য ধর্মের ব্যক্তিকে চিরতরে নির্মূল করাই যে সেই ধর্মের মূল কথা, তা স্বামীজিও স্বীকার করেছেন। খ্রিস্টান ধর্মের ক্ষেত্রেও তিনি একই কথা বলেছেন। এই ক্ষেত্রেই হিন্দুধর্ম অনন্য, শ্রেষ্ঠ। তাই যে সকল ব্যক্তির মতে, ভারত ধর্মনিরপেক্ষ কারণ এই দেশে সব ধর্মের লোকেরাই মিলেমিশে থাকে, বলাই বাহুল্য যে, এই মতবাদ সর্বৈব মিথ্যা। ভারত ধর্মনিরপেক্ষ কারণ এই দেশে হিন্দুরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। যেদিন হিন্দুরা আর সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকবে না, সেইদিনই ভারত হয়ে যাবে ইসলামিক রাষ্ট্র। স্বামীজি একথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, ভারতের আদি অধিবাসীরা চিরকালই ছিল হিন্দু। গায়ের জোরে, তলোয়ারের বা বন্দুকের ভয় দেখিয়ে কিংবা সুকৌশলে কোনো প্রলোভন দেখিয়ে তাদের একটা অংশকে মুসলমান বা খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে। তাই এরা যদি পরবর্তীকালে আবার হিন্দুধর্মে ফিরে আসতে চায়, তবে অবশ্যই তার ব্যবস্থা করা উচিত।

মুসলমান বা খ্রিস্টানরা যে বিদেশ থেকে ভারতে এসেছিল, একথা তো সর্বজনবিদিত। কিন্তু, আর্যরা? পাশ্চাত্যের হিন্দুধর্মবিদ্বেষী পণ্ডিতেরা এবং তাদের অর্থে সম্পদশালী হয়ে ওঠা ভারতীয় ধান্দাজীবী ব্যক্তিরা এই কথাই বলে যে, আর্যরা ভারতের আদি বাসিন্দা নয়। আর্যরা বহিরাগত ছিল এবং এদেশের আদি অধিবাসীদের সঙ্গে লড়াই করে তাদের পরাজিত করে, তবেই আর্যরা ভারত দখল করতে সমর্থ হয়। এমনকি এই সকল হিন্দু ধর্মবিদ্বেষীরা ভগবান রামচন্দ্রকে বলে অত্যাচারী, পররাজ্যলোভী, অনার্যদের উপরে যারপরনাই শোষণকারী ইত্যাদি। ভারতবর্ষের বিদ্যালয়ে একেবারে নিম্নস্তর থেকে এইসব শেখানোও হয়ে থাকে। বলাই বাহুল্য যে, এই সবই আসলে হিন্দুত্বের জাগরণ যাতে না ঘটতে পারে, তার জন্য এক সুপরিকল্পিত প্রয়াস। এই ব্যাপারে স্বামীজি চরম বিদ্বেষ প্রকাশ করে বলেছেন যে—"**ঐ যে ইউরোপী পণ্ডিত বলছেন যে, আর্যেরা কোথা হতে উড়ে এসে ভারতের বুনোদের মেরে-কেটে জমি ছিনিয়ে নিয়ে বাস করলেন—ও-সব আহাম্মকের কথা। আমাদের পণ্ডিতেরাও দেখছি সে গোঁয়ে গোঁ---আবার ঐ সব বিরূপ মিথ্যে ছেলেপুলেদের শোনানো হচ্ছে। এ অতি অন্যায়।**" (৬।২০৯)

"**কোন বেদে, কোন সূক্তে, কোথায় দেখছ যে, আর্যরা কোন বিদেশ থেকে এদেশে এসেছেন? কোথায় পাচ্ছ যে তাঁরা বুনোদের মেরে কেটে ফেলেছেন? খামকা আহাম্মকির দরকারটা কি? আর রামায়ণ তো পড়া হয়নি, খামকা এক বৃহৎ গল্প রামায়ণের উপর কেন বানাচ্ছো?**" (৬।২১০)

"**রামায়ণ কিনা আর্যদের দক্ষিণী বুনো-বিজয়!! বটে-রামচন্দ্র আর্য রাজা, সুসভ্য; লড়ছেন করে সঙ্গে? লঙ্কার রাবণ রাজার সঙ্গে। সে রাবণ, রামায়ণ পড়ে দেখ, ছিলেন রামচন্দ্রের দেশের চেয়ে সভ্যতার বড় বই কম নয়। লঙ্কার সভ্যতা অযোধ্যার চেয়ে বেশি ছিল বরং কম তো নয়ই। তারপর বানরাদি দক্ষিণী লোক বিজিত হল কোথায়? তারা হল সব শ্রীরামচন্দ্রের বন্ধু মিত্র। কোন্ গুহকের, কোন্ বালির রাজ্য রামচন্দ্র ছিনিয়ে নিলেন তা বলো না?** (৬।২১০)

"**ইউরোপের উদ্দেশ্য—সকলকে নাশ করে আমরা বেঁচে থাকবো। আর্যদের উদ্দেশ্য—সকলকে আমাদের সমান করব, আমাদের চেয়ে বড় করব। ইউরোপের সভ্যতার উপায়—তলওয়ার; আর্যের উপায়—বর্ণবিভাগ। শিক্ষা সভ্যতার তারতম্যে, সভ্যতা শেখবার সোপান—বর্ণবিভাগ। ইউরোপে বলবানের জয়, দুর্বলের মৃত্যু; ভারতবর্ষের প্রত্যেক সামাজিক নিয়ম দুর্বলকে রক্ষা করবার জন্য।**" (৬।২১১)

অনেকের মতে, স্বামীজি 'হিন্দু'-শব্দের তেমন একটা প্রয়োগ করেননি। তিনি বৈদান্তিক-শব্দের বেশী প্রয়োগ করতেন। এটাও একটা হিন্দু-বিরোধী ষড়যন্ত্র। হিন্দুধর্ম ও বেদ-বেদান্ত যে সমার্থক, একথা স্বামীজি বারে বারেই বলতেন। তাঁর কথায়—"**বেদের ধর্মই হিন্দুদিগের ধর্ম।**" (৩।৩৬৮)

তিনি আরও বলেছেন যে—"**বেদের পরে জগতের যে কোন স্থানে যে কোন ধর্মভাবের আবির্ভাব হয়েছে, তা বেদ থেকে নেওয়া বুঝতে হবে।**" (৯।৪৮৭)

"**ভারতের সকল সম্প্রদায়—দ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী অথবা সৌর, শাক্ত, গাণপত্য, শৈব, বৈষ্ণব যে কেহ হিন্দু ধর্মের অন্তর্ভুক্ত থাকিতে চাহে, তাহাকেই বেদের এই উপনিষদ্ ভাগকে মানিয়া চলিতে হইবে।**" (৫।১৬)

"**হিন্দুধর্ম-আক্রমণকারী অজ্ঞ সমালোচকগণের পুনঃ পুনঃ প্রতিবাদ সত্ত্বেও এখনও শ্রুতিই হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মেরুদণ্ডস্বরূপ।**" (৫।৪৪৭)

হিন্দুত্ব প্রসঙ্গে অনেক ব্যক্তির অভিমত এটাই যে, কেন সমাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাসচর্চা ইত্যাদি সব কিছুই ধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকবে! এটা তো উচিত নয়। এই ব্যাপারেও স্বামীজি ভিন্নমত পোষণ করতেন। যারা এই কথাই প্রচার করে যে, স্বামীজি সেবা করবার কথা ছাড়া আর কিছুই বলেননি, তারা মিথ্যা কথা বলে। সব কিছুই হোক ধর্মের মাধ্যমে, এটাই ছিল তাঁর অভিমত। সবার আগে চাই হিন্দুত্বের পুনর্জাগরণ ও সংগঠিত, ঐক্যবদ্ধ হিন্দু-সমাজ। তবেই হবে ভারতের প্রকৃত উন্নতি। ভারত হিন্দুত্বের ধ্বজা উড্ডীয়মান করেই পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করবে, স্বামীজি এটাই চেয়েছিলেন। এদিক থেকে দেখলে, তাই বলা যেতেই পারে যে, ভারত এক হিন্দুরাষ্ট্র হিসেবে গড়ে উঠুক, এই ছিল তাঁর ইচ্ছা ও নির্দেশ। স্বামীজীর মতে—'**আমরা হিন্দু। আমি এই হিন্দু শব্দটি কোন মন্দ অর্থে ব্যবহার করিতেছি না; আর যাহারা মনে করে, ইহার কোন মন্দ অর্থ আছে, তাহাদের সহিত আমার মতের মিল নাই।**" (৫।২৬৯)

"**এখন ধর্ম ও হিন্দু—এই দুইটি শব্দ একার্থবাচক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।..... অসভ্য জাতিসমূহ তরবারি ও বন্দুক লইয়া বর্বর ধর্মসমূহ আমদানি করিয়াছে....।**" (৫।২৭২)

স্বামী বিবেকানন্দের হিন্দুত্ববাদী ভাবনাকে কোনো একটামাত্র সীমিত প্রবন্ধে আলোচনা করা একেবারেই সম্ভব নয়। তাই, এই প্রবন্ধে যৎকিঞ্চিৎ সামান্য প্রয়াসমাত্র করা হয়েছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে সনাতন হিন্দুত্ববাদের জয়ধ্বজা বিজয়দর্পে যিনি উড্ডীয়মান করেছিলেন, তিনি স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর বাণী, তাঁর চিন্তা-ভাবনা, তাঁর নির্দেশাবলি অনুসরণে আগামী দিনে ভারত হিন্দুত্বকে হাতিয়ার করে সারা বিশ্বে চালকের আসনে প্রতিষ্ঠিত হোক, এটাই প্রার্থনা।

অসভ্য ভারতীয়রা তৈরি করেছিল এত বড় সভ্যতা !!

সুদীপ নারায়ণ ঘোষ

পর্ব - ১

বেশ চলছিল। ওরা মানে ইউরোপ-আমেরিকার খ্রিস্টানরা একটা মিথ, বা সরল বাংলায় মিথ্যা, ভারত-তথা-বিশ্বের উপর চাপিয়ে দিয়েছিল। সেটা কী? না, ভারতীয় বৈদিক সভ্যতা বা তার উত্তরসূরী তৎকালীন (উনবিংশ শতকের কথা বলা হচ্ছে) হিন্দুরাও ইরোপীয়দের মত আদতে বিদেশি আক্রমণকারী। তারা সাবেক দ্রাবিড় ভারতবাসীদের কচুকাটা করে ভারতে ঢুকে তাদের সুদূর দুর্গম দক্ষিণ ভারতে তাড়িয়েছিল। তারপর তারাই বেদ উপনিষদ প্রভৃতি ভাল ভাল জিনিস বানিয়েছিল। **ভারততত্ত্ববিদদের গুরু জার্মান ফ্রেডরিখ ম্যাক্সমুলার এই কথা রটিয়েছিলেন কারণ তাঁকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ও রোমান ক্যাথলিক পাদ্রীরা নিয়োগ করেছিল যাতে এদেশের অগাধ সম্পদ খ্রিস্টান ঔপনিবেশিকরা যথেচ্ছ লুটপাট করতে পারে এবং তার বৈধতা ও নৈতিক যাথার্থ্য প্রদান করা যায় তা সুনিশ্চিত করতে এবং ভারতের আদিম ধর্ম ও সভ্যতাকে খাটো করে কীকরে খ্রিশ্চিয়ানিটি অনুপ্রবেশের পথ সুগম করা যায় তার পথ বাৎলাতে।** এই সংস্কৃত ও বহুবিধ ভাষায় শিক্ষিত প্রতিভাবান কিন্তু বেকার জার্মান যুবককে ব্রিটিশরা কাজে লাগিয়েছিল ভাল বেতনের বিনিময়ে, যেমন এখন অনেক মেধাবী ভারতীয়কে কাজে লাগাচ্ছে। (আর এক বেকার জার্মান যুবক মার্ক্সের কথাও আসবে এই প্রসঙ্গে পরে এই প্রবন্ধে ও অন্য নানা প্রবন্ধে।)

কিন্তু গোল বাধল যখন ১৮৭০ সালে হরপ্পা সভ্যতার ধ্বংসস্তূপ আবিষ্কার হল। দেখা গেল সেই সভ্যতা বেশ প্রাচীন যা ইউরোপীয় সভ্যতার চেয়ে অনেক আগেকার। তাহলে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায় রইল? তাও একরকম চাপাচুপি দিয়ে চলছিল। আবার ঝামেলা বাধল ১৯২১ সালে মহেঞ্জোদারো সভ্যতার উদ্ঘাটনের পর। এ তো যে সে ব্যাপার নয়। একেবারে উন্নত সভ্যতা। চমৎকার রাস্তাঘাট, পয়ঃপ্রণালী, জলসেচের ব্যবস্থা, ভবন, টার্শিয়ারি এলাকা, একেবারে পরিকল্পিত নগরায়ণ। এটা শুধু এখানেই আটকে রইল না, হরিয়ানার রাখিগারিতেও পাওয়া গেল। আরও আরও বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে এই সভ্যতা বেরিয়ে পড়ল। যখন মহেঞ্জোদারো সভ্যতা আবিষ্কার হল তখন ওরা মুশকিলে পড়ল। **আর্যরা তো বুনো ছিল। কিন্তু আর তো এদের বুনো বলা যাচ্ছে না। তা হলে কী হবে? তখন এরা দ্রাবিড় সভ্যতার গল্প বানালো। ওরা মানে দ্রাবিড়রা এত শান্তিপ্রিয় ছিল যে তারা যুদ্ধ করতে জানত না। তবে এখন তাদের অনেক দুর্গ পাওয়া গেছে। আর্যরা এল; শুধু বেদ উপনিষদ নয় তারা যুদ্ধ করতে পারত। সব নগর ভেঙে দ্রাবিড়দের তাড়িয়ে তাদের দক্ষিণ ভারতে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হল। ভাবুন, যারা এত উন্নত নগর তৈরী করতে জানত তারা যুদ্ধ করতে জানত না। আজব ব্যাপার! এমন কি এরা চাষবাস করতেও জানত না। আশ্চর্য ব্যাপার! এত উন্নত নগর সভ্যতা অথচ তারা চাষ করতে জানত না। তা হলে এরা খেত কি? বনজঙ্গল থেকে কাঁচা মাংস এনে আগুনে ঝলসে খেত!!**

সাড়ে তিন হাজার বছরের বেশী পিছোনো যাচ্ছে না কেন? কারণ বাইবেলের মতে যিশুর জন্মের ৪০০৪ বছর আগে ঈশ্বর পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন। সাত দিনে ঈশ্বর পৃথিবী তৈরী ক রলেন; এই কথাটা কিছুদিন আগে পর্যন্ত সব খ্রিস্টান জ্ঞানীগুণিরা বিশ্বাস করতেন আর এখনো অনেক কট্টরপন্থীরা বিশ্বাস করেন। তারপর ঈশ্বর নিজের আদলে অ্যাডামকে সৃষ্টি করলেন এবং অ্যাডামের পাঁজর থেকে ইভকে তৈরী করলেন। আর অ্যাডামের পাঁজর থেকে তৈরী বলে ইভের কোনো আত্মা নেই। তাঁরা স্বর্গ থেকে নির্বাসিত হলেন। তারপর পুরো পৃথিবী পাপে ভরে গেল। ঈশ্বর পৃথিবী ধ্বংস করে দিলেন। শুধু নোয়াকে বাঁচিয়ে রাখলেন। তাঁর পছন্দের মানুষ, জীবজন্তু সব জোড়ায় জোড়ায় একটি জাহাজ (নোয়া'জ

আর্ক) তৈরি করে তাতে তুলে দিলেন সেই প্রলয়ংকারী বন্যা থেকে বাঁচাতে। তারপর নোয়ার থেকে মানুষের সভ্যতা শুরু হল। তারপর ইব্রাহিম থেকে ক্রমশঃ যীশু এবং যীশু থেকেই প্রকৃত সভ্যতার শুরু। কিন্তু ততদিনে, মানে এই **আর্য আক্রমণ তত্ত্ব চালু হওয়ার কিছু পরে পরেই, ডারউইনের বিবর্তনবাদ এসে গেছে। ডারউইন দেখালেন মানুষ একদিনে সৃষ্টি হয়নি। ধীরে ধীরে অন্য প্রাণীর থেকে মানুষ তৈরী হয়েছে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে। অন্যদিকে পদার্থবিজ্ঞানে দেখাচ্ছে মহাকাশের রহস্য, আরো সব জিনিস। তাতে করে বাইবেল কথিত ঈশ্বরের সাতদিনে পৃথিবী, গাছপালা, মানুষ সহ সব জীবজন্তু, মায় সূর্যচন্দ্র আকাশ, নক্ষত্র সৃষ্টি, এসব ধোপে ঠিকছে না। তখন খ্রিস্টান বিজ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবীরা বুঝলেন বাইবেলের এই থিওলজি আর চলবে না। এসব ভুল। কিন্তু তারা তা মুখে বলতে পারছে না। (এখনও যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হয় যে ডারউইনের তত্ত্বটা শুধু একটা তত্ত্ব মাত্র, সত্যি নয়।) তাঁরা বুঝতে পারছেন, আর্যরা, বাইরে থেকে আসুন বা না আসুন, তাঁরা অনেক পুরোনো। এই সত্যটা কিছুতেই খ্রিস্টানরা মানতে পারলো না। তখন জাতি ব্যবস্থা, মানে রেসিজম, চালু করল। যেভাবে হোক দেখাতে হবে, আমরা, মানে খ্রিস্টানরা, শ্রেষ্ঠ আর্য—তাই জাতি তৈরী করো, দ্রাবিড় জাতি তৈরী করো। ভারতে ২৩৮৭ টা জাত খুঁজে পেল তারা, এখানে এসে দিনের পর দিন থেকে এটা করল। কিসের ওপর ভিত্তি করে তারা এটা করল? না, এটা করল চামড়ার রং আর নাকের গঠন দেখে। এটাও আজব। কারণ এখন জেনেটিক্সের কল্যাণে আমরা সবাই জানি যে ঐ ভাবে জাতি বা জাত হয় না। উপমহাদেশের সবাই জেনোম অনুযায়ী একই জাত ভুক্ত। কার্ল মার্ক্স ভারতে কোনো দিন না এসে ভারতের নিজস্ব কোনো ইতিহাস নেই বলে বসলেন। তাঁর ভারত সম্পর্কে কোনো ধারণাই ছিল না। তাঁর কিছু বন্ধুবান্ধব ছিল ইউরোপে, তাদের মুখে শোনা কার্ল মার্ক্সের বিদ্যা, মানে ভারতবিদ্যা। যেমন যীশু ঈশ্বরপুত্র, তেমনই মার্ক্স সমাজবিজ্ঞানের অবিসংবাদিত প্রবক্তা এবং যেহেতু তাঁর তত্ত্ব একটা বিজ্ঞান, তাঁর স্তাবকরা তাই বলে, তাঁর সব কথা নিউটনের সূত্রের মতই অর্থাৎ মার্ক্সবাদ একটা ডগমা, সুপারস্টিশনও বটে।**

ওরা বলতে চাইল এই আর্যরা তাদের মধ্যে থেকে ভারতে এসেছিল। তারা এখানে এসে বেদ উপনিষদের মত ভাল জিনিস তৈরী করল। কিন্তু এখানকার লোকের সঙ্গে মিশে তাদের একটা দূষণ ঘটেছিল। তাই তারা আবার অন্ধকারে ডুবে গিয়েছিল। তাই আবার ইউরোপীয় আর্যদের আসার দরকার তাদের উদ্ধার করার জন্য। সঙ্গে আসবে ক্রিশ্চিয়ানিটি।

এই আর্য আক্রমণ তত্ত্ব শুধু আমাদের মিথ্যে ইতিহাস তৈরী করার জন্যই নয়, এটা ওদের নিজেদের জন্যও দরকার। প্রত্যেক জাতির একটা গর্বের জায়গা থাকা দরকার। ইটালির রেনেসাঁ, ফ্রান্সের বিপ্লব, ব্রিটেনের গণতন্ত্র, স্পেনের মধ্যযুগের মহান পর্ব। জার্মানির সেরকম কোনো জায়গা ছিল না। তাই সবাইকে এক ছাতার তলায় আনার জন্য একটা আর্য তত্ত্ব ভুল ভাবে খাড়া করা হল। সবাইকে এক আর্যত্বের ছাতার তলায় আনা হল।

দুর্গা অনার্য, কালী অনার্য। তা হোক না। এগুলো রূপক। শিবকে মানা হচ্ছিল না। তাকেও আনা হল। তাতে ক্ষতি কি? আমরা তো অনার্যদের আর্যীকরণ করেছি। এই তন্ত্র বাংলা থেকে এসেছে। আমরা যদি ইতিহাস বলতে শুরু করি তাহলে সারা পৃথিবীর ইতিহাস বেরিয়ে পড়বে। কালীর জন্য আমাদের এতবড় জায়গা রয়েছে; আমরা অনেক কিছুকে গ্রহণ করতে পারি। অনার্য খারাপ নয়। বলা হচ্ছে দুর্গা বহিরাগত। সেক্ষেত্রে বলতে হয় **মানুষতো এসেছিল পূর্ব আফ্রিকা থেকে। তাহলে অন্য জায়গার সবাই বহিরাগত।**

ওরা বলতে চাইল এই আর্যরা তাদের মধ্যে থেকে ভারতে এসেছিল। তারা এখানে এসে বেদ উপনিষদের মত ভাল জিনিস তৈরী করল। কিন্তু এখানকার লোকের সঙ্গে মিশে তাদের একটা দূষণ ঘটেছিল। তাই তারা আবার অন্ধকারে ডুবে গিয়েছিল। তাই আবার **ইউরোপীয় আর্যদের আসার দরকার তাদের উদ্ধার করার জন্য। সঙ্গে আসবে ক্রিশ্চিয়ানিটি। কিন্তু তা করতে গিয়ে যদি ভারতীয়রা বাধা দেয় তখন? তাই প্রচার করা হল যে ভারত ধর্মের দেশ, শান্তির দেশ।** রামায়ণ রাম এসব কাল্পনিক। ওসব যুদ্ধ টুদ্ধ কিছু হয়নি। মহাভারত, কৃষ্ণ সব মিথোলজিকাল।

মহাভারতের যুদ্ধ বানানো। ওটা একটা সামান্য পারিবারিক দ্বন্দ্ব। ওটাকে একটা মহান বিশাল আকার দেওয়া হয়েছে এক কবির উদ্ভট কল্পনায়। ওসব কথা বানানো। অর্জুন গান্ধীর মত কথা বলছিলেন। তখন কৃষ্ণ তাকে ধমকালেন, তাকে বোঝালেন যুদ্ধকে কিভাবে একটা যোগের কলায় পরিণত করা যায়। ভারতের শিবাজি, রাণা প্রতাপ, সুহেল দেব ক্রমাগত মুঘলদের বাধা দিয়েছেন—ওরা বলল তাদের ছোট, নগণ্য করে দেখাও। ভারতীয়রা যুদ্ধ করেও দেখিয়ে এসেছে বরাবর। ইউরোপীয়রা তাদের অস্বীকার করতেও পারে না। পুরোটা স্বীকারও করা যায় না। তাই তাদের উল্লেখ থাকবে কিন্তু তাদের খুব অপ্রাসঙ্গিক করে দেখানো হল। কারণ ভারতীয়রা কোনোদিন যুদ্ধ করেনি বলতে হবে। তারা তো শান্তিপ্রিয়। অথচ এদের পূর্বপুরুষ এত ভয়ঙ্কর যুদ্ধবাজ যে নিরীহ দ্রাবিড়দের কেটেকুটে তাদের একেবারে সুদূর দক্ষিণ ভারতে পাঠিয়েছিল? এইসব জলজ্যান্ত মিথ্যে আমাদের পণ্ডিতরা ধরতে পারেন না?

তারপর তাঁরা খুঁজে পেলেন মহাবীর জৈন, গৌতম বুদ্ধকে আর এযুগে তাঁরা খুঁজে পেলেন তাঁদেরই তৈরি করা আরেক অহিংসার প্রতিমূর্তি গান্ধীকে (কি কুক্ষণে তাকে মহাত্মা বলা হয়েছিল জানি না)। গান্ধী বললেন মুসলমান, খ্রিস্টান ধর্মে যুদ্ধ অনুমোদিত। আমাদের ধর্মে যুদ্ধ নেই। কিন্তু আমাদের দেবদেবীদের হাতে অস্ত্র যেমন গদা, তির, ধনুক, চক্র, খাঁড়া আছে, ত্রিশূল, বজ্র আছে এসবকে অস্বীকার করা হল। (এখন জোর চেষ্টা চলছে দুর্গা বা কালীকে অস্ত্রহীন করে দেখানোর।) এসব সূক্ষ্ম জিনিস সরল জনগণ বুঝতে পারে না এবং এই যে তারা পারে না সেটা ধূর্ত শিয়ালেরা বুঝেছে বলেই ওরা সেটাকে ন্যক্কারজনকভাবে ব্যবহার করছে। কাপুরুষতা কখনোই ধর্ম হতে পারে না। দরকারে যুদ্ধ করতে হয়। শত্রুর সঙ্গে চোখে চোখ রেখে লড়াই করতে হয়। কিন্তু সারাক্ষণ এই ইউরোপীয়রা এবং আমেরিকানরা বলে চলেছে ভারত হল অহিংসার দেশ, শান্তির দেশ। এসব বলে বলে আমাদের বোকা বানানো হচ্ছে। একটা জাতিকে মেরুদণ্ডহীন, কাপুরুষ নপুংসক, মেষের জাতিতে পরিণত করার চেষ্টা চলেছে। আর আমরা গদগদ ভাবে আপ্লুত হয়ে সেসব কথা শুনি আর গৌরবান্বিত হই। কিন্তু এইভাবে তো চলতে পারে না।

তারা আমাদের বলে কি সুন্দর অহিংস তোমরা! তাই তোমরা গান্ধীকে মহান করো আর নেতাজিকে ছোট করো। সেই গান্ধীই নিজে জুলু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বর্ণবাদী ব্রিটিশ প্রভুদের হিংস্র ব্যুয়র যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই গান্ধীই আবার প্রায় ১৩ লাখ ভারতীয় সৈনিক জওয়ানকে প্রেরণা জুগিয়েছেন ইংলণ্ডের হয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে, প্রাণ বিসর্জন দিতে। মারা গেছে প্রায় পঁচাত্তর হাজার ভারতীয়। আরো অনেকে আহত হয়েছেন। ব্রিটেন ভারতে প্রায় ১১১টা যুদ্ধ করেছে—সবকটা ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে। তিনিই আবার ২য় বিশ্বযুদ্ধে ২৫ লাখ ভারতীয় সৈন্যকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে বলেন। তিনি তাদের সত্যাগ্রহ, অনশন, আইন অমান্য, অসহযোগ কিছু করতে বলেননি। কত বড় কপটতা! সুভাষচন্দ্রসহ আরে অনেক কংগ্রেস নেতা ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে বলেছিলেন যে এই সুযোগ, এই সময়ে ইংরেজদের দেশ ছাড়তে বলুন। তিনি শোনেননি। 'আপনি ভারতীয় সৈন্যকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে বলবেন না।' তিনি বললেন, 'না, এটা অন্যায় হবে। ওরা আমাদের জন্য কত কিছু করেছে।' সব দেশ মিলে যত সৈন্য বিশ্বযুদ্ধে যোগ দিয়েছে ভারতীয় অংশগ্রহণ করেছে তার চেয়ে বেশী। অথচ কোথাও এটা স্বীকার করা হয়নি। যদি ভারতীয় সৈন্য অংশগ্রহণ না করত তাহলে ব্রিটেনকে জার্মানির কাছে হেরে গিয়ে তাদের কলোনি হয়ে থাকতে হতো। এই কথা বলাতে সম্প্রতি ব্রিটেন বলছে, 'হ্যাঁ, তা বটে।'

তাঁরা বলছেন রাম কাল্পনিক আবার একই নিশ্বাসে বলছেন রামরাবণের যুদ্ধ আসলে আর্য-অনার্যদের লড়াই। পরস্পরবিরোধিতা কতখানি! এখানে তারা বর্ণবৈষম্য খুঁজে পাচ্ছেন।

প্রত্যেক বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইণ্ডোলজির শাখা আছে। আমাদের বোকা-মেধাবী ভারতীয়রা ভাবে ওরা আমাদের কত শ্রদ্ধা করে। কিন্তু ওরা এটা করে আমাদের পুজো করতে নয় আমাদের ভাঙতে, ছোট করতে; আমাদের খাঁড়ার ঘা মারে, পুজোর ফুল নয়। ওরা যখন সংস্কৃত মন্ত্র শুনে মন্ত্রমুগ্ধ হয় তখন ওরা আসলে খোঁজে আমাদের মধ্যে কোন জায়গা দিয়ে হানা দিতে হবে। ইণ্ডোলজির অনেকগুলো ঢেউ এসেছে, বা ফ্যাশন এসেছে। প্রথম ফ্যাশন মার্ক্সবাদ। কার্ল মার্ক্স মনে করতেন ভারতের গ্রাম ভাল মানে সেখানে একটা স্বনির্ভর গ্রামব্যবস্থা আছে। কিন্তু ভারতীয়রা বানর, গরুর পুজো করে। এটা অসভ্যতা। ইংরেজ শাসন ভাল কারণ তাহলে এদেশে সশস্ত্র

বিপ্লব হবে। সুতরাং ইণ্ডোলজির প্রথম ঢেউয়ে ভারতের 'সব ভালকে অস্বীকার করে, তাদের মূর্তি ভেঙে, তাদের কালিমালিপ্ত করে শেষ করে দাও।'

দ্বিতীয় ঢেউ হচ্ছে—বিপ্লব আর হবে না এটা ওরা অবশেষে বুঝল। ততদিনে এটা বুঝতে যে যা কিছু ভাল সব ভারত থেকে গেছে আর সব খারাপ , বাইরে থেকে ভারতে এসেছে। তাই ওরা শুরু করল কলোনিয়ালিজমকে বেশী করে গালাগাল দিতে। এর নাম পোস্ট—কলোনিয়ালিজম। ইজম বা বাদ মানুষের তৈরী করা। আর ধর্ম স্বাভাবিক। ওরা বলতে শুরু করেছে **হ্যাঁ, ব্রিটেন ভারতে উপনিবেশ করেছিল, ভারত সুপারপাওয়ার ছিল কিন্তু তাদের যা কিছু ভাল সব মুঘল আমলে। তার আগে কিছু ছিল না। তার আগে আর কিছুতেই যাওয়া যাবে না। সব ভয়ঙ্কর বুনো, স্যাভেজ। এটাই পোস্ট-কলোনিয়ালিজম।**

তারপর এল **পোস্ট-মডার্নিজম**। এইটা বেশ মজার। এই ধারণাটা এসেছে খুব বেশি হলে দেড়শো থেকে আড়াইশো বছর আগে। **ঔপনিবেশিকরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পেরিয়ে এসে ঠিক করল এক একটা দেশকে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বেঁধে দাও। তাদের একটা ভাষা, একটা ধর্ম, একটা রেস বা জাতি থাকবে।** অতি বামপন্থীরা বলল এই নেশন স্টেট ভেঙে দিতে হবে। কারণ এরা হল শোষণ যন্ত্রের হাতিয়ার। আর **ভারতের ক্ষেত্রে তো নেশন স্টেটের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। এখানে কোনোদিনই একটা স্টেট ছিল না। একটা ভাষা কোথায়? এখানে তো অনেকগুলো ভাষা। এখানে একটা ধর্ম কোথায়? কোথায় একটা জাতি? এখানে তো অসংখ্য জাতি। কট্টর বামরা বলল, এটাই ওদের মূল লক্ষ্য, ভারতকে ধর্ম, ভাষা ও জাতির জন্য আলাদা আলাদা রাষ্ট্রে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দাও। এই কাজে খ্রিস্টান ভ্যাটিকান ও আরব দুনিয়া হাত মিলিয়েছে। সঙ্গে চীনকে নিয়ে নিয়েছে, যে চীন ক্রমশঃ ক্রিশ্চিয়ানিটির দিকে ঝুঁকছে।** সেখানেদাবি মতো ৬১% নাস্তিক (তার মধ্যে অজ্ঞেয়বাদী বা অন্যাগনস্টিকরাও আছে), তাওবাদী বা কনফুশিয় দর্শনে বিশ্বাসী ২১.৯% , বৌদ্ধ ৬%, খ্রিসিচয়ান ২%, লোক ধর্ম ২%, ইসলাম ২%। এই **লোকধর্ম ও আস্তিকদের মধ্যে একটা বিশাল অংশ প্রাচীন ভারতীয় ধর্মে বিশ্বাসী। তাদের কথা চীনের কম্যুনিস্ট শাসকরা চেপে রেখেছে। ওরা বলছে আগে ভারত নেশন স্টেট হোক তারপর তা ভাঙার কথা আসবে।**

এরপর আসে **সাব-অল্টার্ন তত্ত্ব, বিকল্প বা উপ-বিকল্প। মানে যেসব আদিবাসী যাদের কথা কেউ বলেনি বলেনা তাদের কথা বলতে হবে। এই তত্ত্ব বিদেশ থেকে আমদানি করা।** এখানকার পণ্ডিতরা যা বলেন সভায়, সেমিনারে তাঁরা ঐ বিদেশিদের কথা আউড়ে যান। তোতাপাখি সব। অথচ এরাই সমাজে কলার তুলে ঘোরে। হ্যাঁ একটা কথা। **ওরা শুধু আর্য-দ্রাবিড় ভাগই করেনি। ওরা বলেছিল দ্রাবিড়রাও বাইরে থেকে এসেছিল তারা মুণ্ডাদের তাড়িয়ে ঢুকেছিল। অর্থাৎ মুণ্ডারাই এদেশের আদি অধিবাসী। যাই হোক। এরা বলছে ভাঙা সব। আমরা বলছি দ্রাবিড় বলে কিছু নেই। ডঃ নাগস্বামী** একজন বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক। তিনি বলেছেন **তামিলনাড়ুতে ৮৫ হাজার মন্দির আছে। তার মধ্যে ৬৫ হাজার বেশ পুরানো মানে তথাকথিত কল্পিত আর্য আক্রমণের আগে। শুধু তাই নয়। সেখানকার মন্দির সব হিন্দু দেবদেবীতে পূর্ণ। দ্রাবিড়রা হিন্দু আর্যদের থেকে আলাদা হলে তা সম্ভব হত? অথচ শুধু দ্রাবিড় জাতিগত অস্মিতা নিয়ে দু'টো রাজনৈতিক দল বছরের পর বছর তামিলনাড়ু রাজ্যের শাসনভার পাচ্ছে পর্যায়ক্রমে।**

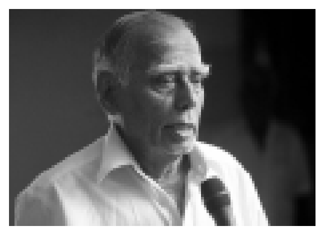

তামিল পণ্ডিতরা বলছে যে তামিল ভাষার ৪০% শব্দ সংস্কৃত থেকে নেওয়া। লিপি সংস্কৃতানুসারী, একটু সমকোণে ব্রাহ্মী লিপির অনুকরণ। এটা সম্ভব হয়েছে অগস্ত্য ঋষির হাত ধরে। সপ্ত ঋষির এক ঋষি বিন্ধ্য পর্বত পার হয়ে দক্ষিণে গিয়েছিলেন। সেই অগস্ত্যর পুজো আজো দক্ষিণে হয়। তামিল নাড়ুর যত উপবাস, ব্রত, নাচ ভারত নাট্যম থেকে শুধু করে সব রিচ্যুয়াল গুরুকে প্রণাম করে, শিবকে প্রণাম করে শুরু হয়। সবই উত্তর ভারতের মতো। তাহলে কী করে এই পার্থক্যটা করা যাবে? এই দ্রাবিড় জাত, আর্য জাত একটা তৈরী করা মিথ্যে, একটা শয়তানি, একটা চক্রান্ত। তামিলনাড়ুর লোকের মধ্যে 'আমরা দ্রাবিড়' এই সেন্টিমেন্ট নেই। অর্থাৎ ওরা বিশ্বাস করে না দ্রাবিড়িজমে কিন্তু রাজনীতিটা করে। এই শয়তানিটা চলছে বিগত দুই শতাধিক বছর ধরে, বর্তমানে তা আরও প্রকট হয়েছে। জীবনে নয়, রাজনীতিতে। ... ক্রমশঃ

—০—

ডঃ আম্বেদকারের চোখে হিন্দু মুসলমানের সমস্যা

প্রণব দত্ত মজুমদার

CAA (Citizenship Amendment Act) 2019 সালের 11th Dec. ভারতের সংসদে পাশ করা হয়, যাতে বলা হয়েছে —আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ এই সমস্ত প্রতিবেশি ইসলামিক দেশ থেকে ধর্মীয় কারণে উৎপীড়িত হয়ে ঐসব দেশের যারা ধর্মীয় সংখ্যালঘু অর্থাৎ হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পার্শি এবং খ্রিস্টান ধর্মের লোকেরা যদি ভারতে আশ্রয় নেয় এবং নাগরিকত্ব চায় তবে তাদের নাগরিকত্ব প্রদান করা হবে। নাগরিকত্ব অইনের সংশোধনী আনার সময় ভারতের গৃহমন্ত্রী বলেন ভবিষ্যতে ভারতের নাগরিক পঞ্জি অর্থাৎ NRC (National Register of Citizens) তৈরি করা হবে ভারতের নাগরিকদের স্বার্থে। ব্যাস, বিজেপিবিরোধী মুসলমান তোষণকারী ভণ্ড সেকুলার রাজনৈতিক দলগুলি ও তাদের পোষ্য ভণ্ড বুদ্ধিজীবীকুল হৈচৈ করে আসরে নেমে পড়লেন। তাঁরা এরকম narrative তৈরী করলেন যে বিজেপি সেকুলার ভারতে মুসলমানদের নাগরিকত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার ব্যবস্থা করছে এবং ধীরে ধীরে ভারতবর্ষকে হিন্দুরাষ্ট্র করা হবে এবং মুসলমানদের এ দেশে থাকার আর কোনো অধিকার থাকবে না। এই narrative দ্রুত ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল এবং CAA, NRC, NPR-এর বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ হয়ে গেল। কোনো কোনো জায়গায় ভয়ানক গোলমাল হল। পশ্চিমবঙ্গে তো তিন দিন ধরে মুসলিম জিহাদিরা বাসে আগুন লাগানো, রেললাইন উপড়ে ফেলা, স্টেশন জ্বালানোর মত ভয়াবহ ঘটনা ঘটালো পশ্চিমবঙ্গের ruling party-র প্রচ্ছন্ন মদতে। পশ্চিমবঙ্গে কয়েকশো কোটি টাকার সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করলো তারা।

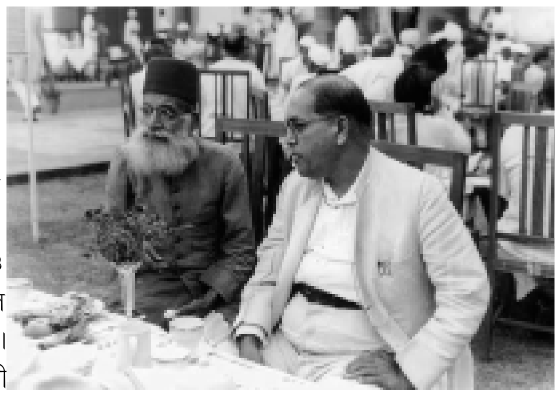

বিজেপি বিরোধী ভণ্ড সেকুলার রাজনৈতিক দলগুলোর এবং তাদের পোষ্য বুদ্ধিজীবীকুল এবং মিডিয়ার মদতে মুসলমান আন্দোলনকারীরা আন্তর্জাতিক মহলে বর্তমান ভারত সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য দিল্লীর শাহিনবাগে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার মোড়ে যেখানে কিনা দিল্লীর প্রতিবেশি রাজ্যগুলি থেকে হাইওয়ে দিল্লীতে প্রবেশ করছে সেরকম জায়গায় অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করে দিল ১৫ই ডিসেম্বর থেকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য যতদিন না সরকার এই আইন বাতিল করে। যাতে পুলিশ বল প্রয়োগ করে এই আন্দোলন ভাঙতে না পারে সেজন্য প্রতিদিন বেশি বেশি করে মহিলা ও শিশুদের জমায়েত করতে আরম্ভ করেছিল আন্দোলনকারীরা। দিল্লীর রাস্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগস্থলে এই অনমনীয় অবস্থান বিক্ষোভের ফলে দিল্লীর ও প্রতিবেশী রাজ্যগুলির ব্যবসা বাণিজ্য অফিস আদালত স্কুল কলেজে পড়াশোনার দফারফা হয়ে গিয়েছিল। অবশেষে কোভিড প্যাণ্ডেমিকের প্রথম ঢেউ যখন ভারতে আছড়ে পড়ল তখন ২০২০-র ২৪ মার্চ এই আন্দোলন বন্ধ হয় দিল্লীর ঐ অংশে এক ভয়াবহ সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে, যাতে হিন্দু ও মুসলমান মিলিয়ে ৫০-এর অধিক লোকের মৃত্যু হয়েছিল। রাজ্য ও জাতীয় স্তরের টেলিভিশন চ্যানেলগুলি লাগাতার ঐ অবস্থান বিক্ষোভের ছবি ও সংবাদের লাইভ সম্প্রচার করেছে।

যেটা খুব লক্ষণীয় বিষয় তা হল আন্দোলনকারীরা তাদের প্ল্যাকার্ড বা পোষ্টারে যাদের ছবি সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেছে তা হল গান্ধীজির এবং সংবিধান প্রণেতা ডক্টর আম্বেদকরের। তারা তো শ্লোগান দিচ্ছিল তাদের 'গান্ধীওয়ালি আজাদি' চাই। 'গান্ধীওয়ালি আজাদি' র রহস্য এখন আমাদের কাছে খুব পরিস্কার। কারণ গান্ধীজির মত ন্যক্কারজনক মুসলমান তোষণ আর কেউ কখনও করে নি। গান্ধীজিই ভারতে মুসলমান তোষণের বীজ ভালভাবে বপন করেছিলেন। সেই পথে হেঁটেই কংগ্রেসও সেই রাস্তা নেয়। যাই হোক, সে অন্য ইতিহাস। আমি তাতে এখন যাচ্ছি না। আমার কথা হল ডক্টর আম্বেদকারের ছবি এমন কি তাঁর ছবির মলাট দেওয়া সংবিধানের কপি বুকে চেপে শ্লোগান দচ্ছিল আন্দোলনকারীরা, কেন? আসলে **ভণ্ড সেকুলার**

বুদ্ধিজীবীকূল যারা ওদের পরামর্শদাতা তারা সবসময়ই তৎকালীন ভারতের দলিত নেতা ডক্টর আম্বেদকারকে তাদের চতুর narrative এর মাধ্যমে একজন হিন্দুবিদ্বেষী হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে এবং সেই narrative এর মাধ্যমে দলিত মুসলিম ঐক্য তৈরী করে তারা জাতীয়তাবাদী বিজেপিকে কোনঠাসা করার চেষ্টা করেছে। এটা ঠিক যে তৎকালীন ভারতের সামাজিক পরিস্থিতিতে তিনি বর্ণহিন্দুদের বিভিন্ন সামাজিক কুরীতির বিরুদ্ধে, অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে প্রচুর আন্দোলন সংগঠিত করেছিলেন এবং হিন্দুসমাজে দলিতদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচুর লড়াই করেছিলেন। সেসঙ্গে এটাও ঠিক যে বর্ণহিন্দুদের উপর রাগবশত তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাই বলে তিনি গান্ধীজির মতো মুসলমানদের মাথায় তুলে নাচার পক্ষেও ছিলেন না। কারণ প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের অধিকারী **ডক্টর আম্বেদকারের ইসলাম সম্পর্কে ধারণা খুবই স্বচ্ছ ছিল। ইসলাম সম্পর্কে সতর্কবার্তাও তিনি আমাদের দিয়েছিলেন। বাংলার দলিত (তফশিলি) নেতা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল যখন দলিত মুসলিম ভাই ভাই বলে মুসলিম লীগকে খুল্লাম খুল্লা সাপোর্ট দিয়েছিলেন তখন বাবাসাহেব আম্বেদকার বলেছিলেন —''তফশিলিদের একটা অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে যে তারা হিন্দুদের অপছন্দ করেন বলেই মুসলমানদের বন্ধু বলে মনে করেন। এই চিন্তাধারা ভুল।''** ডক্টর আম্বেদকার সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন—''The realist must take note of the fact that Musalmans look upon the Hindus as Kaffirs, who deserve more to be exterminated than protected.'' যার বাংলা করলে দাঁড়ায়—''বাস্তববাদীরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করবেন যে মুসলমানরা হিন্দুদের কাফের বলেই মনে করে এবং তাদেরকে রক্ষা করার পরিবর্তে মেরে ফেলাই শ্রেয় বলে মনে করে।'' এটি তিনি লিখেছেন তাঁর বই Pakistan or the Partition of India-র ৯৭ পৃষ্ঠায়। যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল এই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন দেশ ভাগের অব্যবহিত পরে তাঁর লক্ষ লক্ষ দলিত ভাই বোনেদের জীবনের বিনিময়ে। যাই হোক সে অন্য ইতিহাস।

> **বাংলার দলিত (তফশিলি) নেতা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল যখন দলিত মুসলিম ভাই ভাই বলে মুসলিম লীগকে খুল্লাম খুল্লা সাপোর্ট দিয়েছিলেন তখন বাবাসাহেব আম্বেদকার বলেছিলেন —''তফশিলিদের একটা অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে যে তারা হিন্দুদের অপছন্দ করেন বলেই মুসলমানদের বন্ধু বলে মনে করেন। এই চিন্তাধারা ভুল।''**

শাহিনবাগের CAA, NRC, NPR বিরোধী আন্দোলনে মুসলমান তোষণকারী সেকুলারবাদীরা আম্বেদকারের ছবি সামনে রেখে দেশের মানুষের সামনে বিশেষ করে মুসলমান দলিত জনগণের কাছে যে narrative তৈরির চেষ্টা করেছে তা হল—দেখো, দলিত এবং মুসলমানদের মসিহা সংবিধান প্রণেতা হিন্দুবিরোধী ডক্টর আম্বেদকার সংবিধানে তোমাদের যা যা অধিকার দিয়ে গেছেন তা সব এই হিন্দুদের পার্টি বিজেপি-র সরকার বাতিল করে দিচ্ছে। এই হিন্দুবাদী পার্টি বিজেপি বাবাসাহেব আম্বেদকারের সংবিধানকেও মান্যতা দিচ্ছে না, তারা বাবাসাহেবকেও অমান্য করে অপমান করছে। এই ভাবে দেশের আমজনতার সেন্টিমেন্টকে উস্কে দিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে মানুষকে উত্তেজিত করার কৌশল হিসেবে তারা ডক্টর আম্বেদকারকে ব্যবহার করেছে। ডক্টর আম্বেদকার যে মুসলমানদের সম্পর্কে কী ধারণা পোষণ করতেন তা এই ভণ্ড সেকুলাররা কখনও সামনে আনে না। তাঁকে বর্ণহিন্দুবিরোধী দলিত নেতা হিসেবেই উপস্থাপন করার চেষ্টা করে তারা। আসলে **ডক্টর আম্বেদকার ভাল করেই বুঝতেন যে শিক্ষার প্রসারের সাথে সাথে ক্রমাগত সমাজ সংস্কার ও সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে হিন্দুধর্মের এই কুসংস্কার ও অস্পৃশ্যতার অবসান একদিন হবেই; কিন্তু মুসলমানদের ধর্ম যেরকম শিক্ষা দিয়ে থাকে এবং যেরকম ধর্মীয় নিয়ম কানুন ওদের ইসলাম বানিয়ে রেখেছে সেখানে হিন্দু ও মুসলমানদের সহাবস্থান কিছুতেই সম্ভব নয়, সে উচ্চ বর্ণের হিন্দুই হোক অথবা নিম্ন বর্ণের। সবাই ওদের কাছে কাফের, তাই ঘৃণার পাত্র এবং বধযোগ্য। সেকুলারদের প্রচার কৌশলের জোরে ডক্টর আম্বেদকারের এই মনোভাব মুসলমান বা দলিত কেউই সম্ভবত ভাল করে জানেনা তাই এখনও ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে দলিত মুসলিম ঐক্যের নামে জয় ভীম জয় মিম শ্লোগান উঠে। তাই শাহিনবাগের আন্দোলনে বাবাসাহেব ডক্টর ভীমরাও আম্বেদকারের ছবি বুকে চেপে মুসলমানরা শ্লোগান তোলে এবং দলিত নেতারা তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়।**

মুসলমানদের সম্পর্কে বাবাসাহেব ডক্টর ভীমরাও আম্বেদকারের ধারণা একদম স্ফটিকের মত স্বচ্ছ ছিল এবং হিন্দু মুসলমান যে একসাথে কখনোই বসবাস করতে পারবেনা তা তিনি তাঁর লেখা Pakistan or the Partition of India বইতে একেবারে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে বলে দিয়েছেন। সে প্রসঙ্গেই আসবো, তবে তার আগে বাবাসাহেব সম্পর্কে দু চারটি কথা

বলে নেওয়া সমীচীন হবে।

১৮৯১ সালের ১৪ এপ্রিল মধ্য প্রদেশের ইন্দোরে এক মিলিটারি ক্যান্টনমেন্টে ভীমরাও আম্বেদকার জন্ম গ্রহণ করেন এক মাহার পরিবারে। তাঁর পিতা রামজি মালোজি সকপাল ছিলেন বৃটিশ ইণ্ডিয়ান আর্মির একজন সুবেদার (Warrant Officer)। মাহার পরিবারে জন্মগ্রহণ করার দরুণ তাঁকে ছোঁয়াছুৎ এর শিকার হতে হয়েছিল ছোটবেলা থেকেই । যাই হোক, তিনি ছোটবেলা থেকেই অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। সামাজিক বৈষম্য তাঁর মেধাকে আটকে রাখতে পারেনি। তখন তিনিই ছিলেন প্রথম ও একমাত্র বর্ণবহির্ভূত ঘরের সন্তান যিনি ১৯০৮ সালে বোম্বের বিখ্যাত Elphinstone College এ ভর্তি হয়েছিলেন। ১৯১২ সালে উক্ত কলেজ থেকে Economics এবং Political Science নিয়ে ডিগ্রী অর্জন করেন। বরোদার মহারাজের scholarship পেয়ে তিনি ১৯১৩ সালে নিউইয়র্কের কলোম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য যান এবং সেখানে তিনি Economics এ মাস্টার ডিগ্রী এবং ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন করেন। তারপর তিনি পৃথিবী বিখ্যাত London School of Economics থেকেও Economics এ মাস্টার এবং ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন করেন। এখানেই থামেননি ডক্টর ভীমরাও আম্বেদকার। তিনি লণ্ডনের Gray’s Inn থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করেন। একজন বিশাল মাপের পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন তিনি। তিনি দেশে ফিরে কিছুদিন বোম্বেতে অধ্যাপনা করেন। কিছুকাল তিনি বরোদার মহারাজের সেক্রেটারী হিসেবে কাজ করেন। ১৯৩৫ সালে তিনি বোম্বে Law College এর ডিরেক্টর হন। বর্ণ হিন্দুদের ছোঁয়াছুতের বিরুদ্ধে তাঁর লড়াই তাঁকে রাজনীতির আঙিনায় নিয়ে আসে। তার জন্য তিনি রাজনৈতিক দল তৈরী করেন—Independent Labour Party এবং Scheduled Castes Federation. **দলিত স্বার্থে লড়তে গিয়ে এইসময় গান্ধীজির সাথে তাঁর তীব্র মতবিরোধও হয়েছিল। গান্ধীজির কিছু আচার আচরণে প্রজ্ঞাবান ডক্টর আম্বেদকারের মনে হয়েছিল তাঁর দলিত প্রেম রাজনৈতিক স্বার্থ জড়িত এবং লোকদেখানো, তাতে আন্তরিকতা নেই।** যাই হোক ডক্টর আম্বেদকার ছিলেন অসামান্য বিদ্বান ব্যক্তি। তিনি ছিলেন একাধারে আইনজ্ঞ, অর্থনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, নৃতত্ত্ববিদ, সমাজ সংস্কারক এবং রাজনীতিবিদ। তিনি স্বাধীন ভারতের আইনমন্ত্রী (১৯৪৭-১৯৫১) হয়েছিলেন এবং তাঁর নেতৃত্বেই ভারতের সংবিধান রচিত হয়েছিল। তিনি ছিলেন সংবিধান কমিটির চেয়ারম্যন। সে জন্য তাঁকেই সংবিধানের রচয়িতার মর্যাদা দেওয়া হয়।

মুসলমানদের সম্পর্কে ডক্টর আম্বেদকারের ধারণা কীরকম পরিষ্কার ছিল তা ওনার Pakistan or the Partition of India বইটি পড়লেই বোঝা যাবে। উক্ত বইয়ের Chapter IV এ তিনি বর্ণনা করেছেন ৭১১ সালে মহম্মদ বিন কাসেমের ভারত আক্রমণ থেকে আরম্ভ করে ঔরঙজেবের আমল পর্যন্ত কীভাবে মুসলমান আক্রমণকারীরা ভারতবাসীর উপর নারকীয় ইসলামিক অত্যাচার চালিয়েছে, হিন্দুদের রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়েছে, ভারতের সভ্যতাকে তছনছ করে দিয়েছে। Dr. Titus এর লেখা Indian Islam বই থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি লিখেছেন —“Qutb-ud-Din Aybak also is said to have destroyed nearly a thousand temples, and then raised mosques on their foundations..... he built the Jami Masjid, Delhi and adorned it with the stones and gold obtained from the temples which had been demolished....”. (P- 59)

এখন তো মোটামুটি আমরা লেখাপড়া জানা বেশিরভাগ লোকই জানি মুসলমান শাসনকালে ভারতে অমুসলিমদের জিজিয়া কর (মুসলমানদের করের তুলনায় দু’তিন গুণ বেশি) দিয়ে অত্যন্ত হীনভাবে তাদের পরিভাষায় ‘জিম্মি’ বা ‘ধিম্মি’ জীবন যাপন করতে হত। এ ব্যাপারেও বাবাসাহেব আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সুলতান আলাউদ্দিন খিলজির সময় জিম্মি হিন্দুদের অবস্থা কীরকম ছিল তা বর্ণনা করেছেন উক্ত বইয়ের ৬৩ পৃষ্ঠায়। Dr. Titus কে উদ্বৃত করে ডক্টর আম্বেদকার যা লিখেছেন তার বাংলা অনুবাদ এরকম—সুলতানের দরবারে এক কাজী (অন্য একটি লেখায় এই কাজীর নাম পেয়েছি— মুঘিসুদ্দিন) এসেছেন। সুলতান কাজীর কাছে নিদান চাইছেন কাফের হিন্দুদের প্রতি ইসলামের কানুন অনুযায়ী কী রকম আচরণ বৈধ। কাজী নিদান দিচ্ছেন—‘‘কোনো Revenue Officer যখন কাফের দের কাছে কর (জিজিয়া) আদায় করতে যাবে তখন তারা যদি রৌপ্য চায় তবে কাফেরদের উচিৎ হবে বিনা প্রশ্নে অত্যন্ত বিনয় সহকারে সম্মান প্রদর্শন করে স্বর্ণ দেওয়া। ঐ Officer যদি কোনও কারণে রেগে গিয়ে কোনও কাফেরের দিকে নোংরা ছুড়ে দেয় তবে কাফেররা অবশ্যই কোন দ্বিধা নাকরে মুখ হাঁ করে সেই নোংরা খেয়ে নেবে। ওদেরকে এইভাবে জিম্মি হিসেবে অবদমিত করে রাখতেহবে। হিন্দুদের এইভাবে অপমানিত করে রাখা আমাদের বিশেষ ধর্মীয় কর্তব্য, কারণ হিন্দুরা আমাদের পয়গম্বরের শত্রু। পয়গম্বর তো আমাদের নির্দেশ দিয়ে গেছেন — কাফেরদের হত্যা করো, তাদের লুণ্ঠন করো, তাদের বন্দী করে রাখো, তাদের কৃতদাস করে রাখো, তাদের ধন সম্পদ লুঠ করে নাও, তাদের মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তরিত করো নয়তো মেরে ফেলো। তাও তো ভাল-মহান হানিফার অনুগামী আমরা। যাঁর ব্যাখ্যা অনুযায়ী হিন্দু কাফেররা

জিজিয়া দিয়ে বেঁচে থাকার অধিকার পেয়েছে। অন্য মতের অনুসারীরা তো বলেন হয় ইসলাম গ্রহণ কর নয় মৃত্যু বরণ কর।" Dr Titus বলছেন—"The payment of the Jizyah by the Hindus continued throughout the dominions of the sultans, emperors, and kings in various parts of India with more or less regularity......" (উক্ত বইয়ের পৃঃ ৬২)। দীর্ঘ প্রায় ৮০০ বছর ধরে মুসলিম শাসনে এরকম জিম্মির জীবন যাপন করেছে হিন্দুরা। **স্বাধীন ভারতেও কি হিন্দুদেবকোনও মর্যাদা আছে? ধর্মের ভিত্তিতে রীতিমত দাঙ্গা করে দেশ ভাগ করে নেওয়ার পরেও হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতবর্ষে দিব্যি তারা সংখ্যালঘুর আছিলায় মৌলিক ক্ষেত্রগুলিতে হিন্দুদের থেকে বেশি অধিকার এবং ক্ষমতা ভোগ করছে, সিভিল আইন কানুনের ব্যাপারে মুসলিম শরিয়া কানুন চলছে। ভারতে মুসলিম আগ্রাসনের যারা নেতৃত্ব দিয়েছিল সেইসব মুসলমান শাসকদের নামে নানারকম রাস্তাঘাট, স্টেশন, মসজিদ ইত্যাদি জ্বলজ্বল করছে। হিন্দুদের আত্মসম্মানে তাতে লাগছে না, মুসলমান হলে কবে এইসব নাম পরিবর্তন করে ফেলতো। মেজরিটি হিন্দুদের সাহসে কুলোচ্ছে না Uniform Civil Code (সমান নাগরিক সংহিতা) চালু করার দাবি জানাবার যদিও সংবিধানে সেটা চালু করার প্রস্তাবনা রয়েছে। ৮০০ বছর ধরে মুসলমানদের উপদ্রব সহ্য করে যে ফিয়ার সাইকোসিস হিন্দুদের মধ্যে তৈরী হয়েছে তাকেই তারা সেকুলারজিম নামক ভণ্ডামির মুখোশে আড়াল করছে।**

আমরা হিন্দুরা দেশভক্তির তাড়নায় প্রায়ই দাবি করে থাকি ভারতের মুসলমানরা কেন 'বন্দেমাতরম' গাইবে না? এদেশে হিন্দুদের থেকে বেশি অধিকার নিয়ে বসবাস করছে তবে এদেশকে মাতৃভূমি মনে করে ভালবাসবে না কেন ইত্যাদি ইত্যাদি। ইসলাম সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণার অধিকারী ডক্টর আম্বেদকার পরিস্কার করে বলেছেন এটা মুসলমানরা কোনদিনই করবে না। কারণ তাদের ইসলামে ঐ রকম শিক্ষাই দেওয়া আছে। ডক্টর আম্বেদকার উক্ত বইয়ের ২৯৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন— "According to Muslim Canon Law the world is divided into two camps, Dar-ul-Islam (abode of Islam) and Dar-ul-Harb (abode of war). A country is Dar-ul-Islam when it is ruled by Muslims. A country is Dar-ul-Harb when Muslims only reside in it but are not rulers of it. That being the Canon Law of the Muslims, India cannot be the common motherland of the Hindus and the Musalmans." "There is another injunction of Muslim Canon Law called JIHAD (crusade) by which it becomes incumbent on a Muslim ruler to extend the rule of Islam until the whole world shall have been brought under its sway." (page-295) কাজেই বুঝতে পারছেন ? **ভারতবর্ষ তো ওদের যুদ্ধক্ষেত্র .... যুদ্ধ করে ভারতকে দার-উল-ইসলাম এ পরিণত করা ওদের পবিত্র কর্তব্য। কাজেই ভারতবর্ষকে ওদের মাতৃভূমি বা পিতৃভূমি ওরা কোনদিনই মানবে না যতই আমরা প্রেম বিতরণ করি না কেন।** উক্ত বইয়ের ৩০১ পৃষ্ঠায় ডক্টর আম্বেদকার লিখেছেন—"To the Muslims a Hindu is a Kaffir. A Kaffir is not worthy of respect. He is low-born and without status. That is why a country which is ruled by a Kaffir is Dar-ul-Harb to a Musalman. Given this, no further evidence seems to be necessary to prove that the Muslims will not obey a Hindu government." এই হল ইসলাম অনুগামীদের বৈশিষ্ট্য।

ইসলাম সম্পর্কে না জেনে বুঝেই গান্ধীজি মুসলমানদের প্রেম বিতরণ করে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের জন্য একেবারে প্রাণপাত করেছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে (১৯১৯-১৯২০) তুরস্কের খলিফার খলিফাতন্ত্রের অবসান হলে ভারতের মুসলমানরা যখন খলিফার ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য খিলাফত আন্দোলন শুরু করেছিল তখন গান্ধীজি মুসলমানদের তোষণ করে মন পাওয়ার জন্য সেই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। **ইংরেজদের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের নামে এই খিলাফত আন্দোলনই আসলে গান্ধীজি করেছিলেন এবং সেই আন্দোলন কংগ্রেসের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছিলেন। এই আন্দোলনের ফলেই ভারতের বিচ্ছিন্ন মুসলিম শক্তি গান্ধীজির নেতৃত্বে কংগ্রেসের ছাতার তলায় সঙ্ঘবদ্ধ শক্তিতে পরিণত হয়। তারপর থেকে প্রতিবছর ভারতবর্ষের কোথাও না কোথাও হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা লেগেই ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আরম্ভ পর্যন্ত।** ডক্টর আম্বেদকার তাঁর উক্ত বইয়ের ১৪৮ পৃষ্ঠা থেকে ১৮৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত তার সম্পূর্ণ তথ্য তুলে ধরে বলছেন— **"Such is the record of Hindu-Muslim relationship from 1920 to 1940. Placed side by side with frantic efforts made by Mr. Gandhi to bring about Hindu-Muslim unity, the record makes most painful and heart-rending reading. It would not be much exaggeration to say**

that it is a record of twenty years of civil war between the Hindus and the Muslim in India, interrupted by brief intervals of armed peace''. (p.-184) গান্ধীজীর নেতৃত্বে এই ছিল ভারতের অবস্থা। পাঠ্য কেন, কোনও ইতিহাস বই এসব আপনাকে বলবে না। **গান্ধীজির হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের মূলমন্ত্রই হচ্ছে কেবল হিন্দুদের দোষারোপ করে জ্ঞান দিয়ে যাও আর মুসলমানদের দোষ না দেখে তাদের তোয়াজ করে যাও।** ডক্টর আম্বেদকার লিখেছেন—''These are not the only things Mr. Gandhi has done to build up Hindu-Muslim unity. He has never called the Muslims to account even when they have been guilty of gross crimes against Hindus.'' (p-156) ।এখনও তো আমাদের নেতাদের মধ্যে এই প্রবণতাই লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যে গান্ধীজি মুসলমানদের মন পেতে এত প্রাণপাত করেছেন সেই গান্ধীজি সম্পর্কে ইসলামের অনুগামী নেতারা কি জঘন্য মনোভাব পোষণ করতো দেখুন। খিলাফৎ আন্দোলনের অন্যতম দুই মুসলমান নেতা ছিলেন মহম্মদ আলি এবং সৌকত আলি । আলি ভ্রাতৃদ্বয়, যাঁদের নিয়ে গান্ধী ঐ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তাঁদের একজন মহম্মদ আলি যিনি কিনা আবার ১৯২৩ সালে কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেছিলেন তিনি ১৯২৪ সালে আলিগড় এবং আজমীরে বক্তৃতা দেওয়ার সময় বলেছিলেন—''মিস্টার গান্ধী যতই পবিত্র চরিত্রবান ব্যক্তি হন না কেন আমাদের ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি একজন চরিত্রহীন মুসলমানের চাইতেও নিকৃষ্ট।'' (পৃ. ৩০২) এই কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে তাঁকে লক্ষ্ণৌ এর আমিনবাদ পার্কে এক মিটিং-এর সময় জিজ্ঞেস করা হয় তিনি ঐ রকম কথা গান্ধীজির সম্পর্কে বলেছেন কিনা। তিনি কোনও দ্বিধা না করে বলেন—''হ্যাঁ, আমাদের ধর্মের বিচারে একজন চরিত্রহীন অধঃপতিত মুসলমানও মিস্টার গান্ধীর চাইতে ভাল।''এই হচ্ছে হিন্দুদের সম্পর্কে মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গি। এই সব না জেনে বুঝে ওদের সাথে DNA র মিল খুঁজতে গেলে বা ওদের সাথে ভাইচারা দেখাতে গেলে ওরা সেগুলো আমাদের দুর্বলতা হিসেবেই দেখবে এবং ওদের মনোবল আরও বেড়ে যাবে।

এরকম ভাবে সমস্ত কিছু ব্যাখ্যা করে ডক্টর আম্বেদকার উক্ত বইয়ের ৩১৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন— ''Looking back on the history of these 30 years, one can well, ask whether Hindu-Muslim unity has been realized ?'' প্রজ্ঞাবান ডক্টর আম্বেদকার লিখেছেন—**''The history of the last 30 years shows that Hindu-Muslim unity has not been realized...... that the pursuit of Hidnu-Muslim unity is like a mirage''.** ডক্টর আম্বেদকার ঠিকই বলেছেন। যাঁদের ইসলাম নিয়ে কিছু পড়াশুনা করা আছে তাঁরা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করবেন যে হিন্দু মুসলমানের একতার ধারণা মরিচিকা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই **ডক্টর আম্বেদকার ইতিহাস থেকে তুর্কি এবং বুলগেরিয়ার উদাহরণ টেনে এনে পরামর্শ দিয়েছিলেন ভারত ভাগ হলে ঐসব দেশের মত সম্পূর্ণ জনবিনিময় করে নিলে অর্থাৎ সমস্ত মুসলমানরা পাকিস্তান চলে গেলে এবং সমস্ত অমুসলমান ভারতে চলে এলে, তবেই একমাত্র হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান হবে নচেৎ নয়। কত বছর আগে ১৯৪৬ সালে ডক্টর আম্বেদকার মুসলমান সম্পর্কে তাঁর এই উপলব্ধির কথা জানিয়েছিলেন Pakistan or the Partition of India বই এর মাধ্যমে। আমরা তাঁর লেখা থেকে কোনও শিক্ষাই নেইনি।** তাই অনুরূপ পরিস্থিতি আবার তৈরি হয়েছে। যারা বাবাসাহেব ডক্টর ভীমরাও আম্বেদকারের ছবি বুকে চেপে দলিত মুসলিম ঐক্যের জন্য আকাশ বাতাস বিদীর্ণ করেন, বা যারা নিজেদের সেকুলার বলে গর্ব করে মুসলমানদের পক্ষে কথা বলেন, বা যারা তাদের সাথে হিন্দুদের DNA একই বলে ভাই বলে বুকে টেনে নিতে বলেন তারা কি বাবাসাহেবের উক্ত বইটি পড়েছেন ? না পড়ে থাকলে পড়ে নিন। চোখ খুলে যাবে।

পরিশেষে প্রশ্ন থাকবে—**কৌরব পাণ্ডবদের তো একই DNA ছিল, তাহলে শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অর্জুনকে কৌরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উপদেশ দিয়েছিলেন কেন? DNA এক হলেই যদি সব মানুষ একে অপরকে আত্মীয়তার নিবিড় বন্ধনে বাঁধতো তাহলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজের মামা কংসকে বধ করেছিলেন কেন? এই প্রশ্নগুলোর উত্তরের মধ্যেই হিন্দুদের বাঁচার বীজমন্ত্র লুকিয়ে আছে।**

তথ্যসূত্র ঃ

১) Pakistan or the Partition of India– by Dr. B. R. Ambedkar

২) ভারত বিভাজন, যোগেন্দ্রনাথ ও ডঃ আম্বেদকার —শ্রীবিপদভঞ্জন বিশ্বাস।

৩) An Entirely New History of India– Francois Gautier .

মাস্টারদা সূর্য সেন ঃ পরাধীন ভারতবর্ষের এক বিপ্লবী মহাজীবন

অহিন রায়চৌধুরী

ব্রিটিশ ভারতের শৃঙ্খল মোচনে প্রখ্যাত বিপ্লবী মহাত্মা, সশস্ত্র বিপ্লবী বাঘা যতীনের আত্মবলিদানে উদ্বুদ্ধ হয়ে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের এক মহান সৈনিক এবং চট্টগ্রাম বিদ্রোহের অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মহানায়ক মাস্টারদা সূর্য সেন চট্টগ্রাম অস্ত্রগার লুণ্ঠন সহ বহুবিধ বিপ্লবের অধিনায়ক ছিলেন। সম্পূর্ণ নাম সূর্য কুমার সেন। সংক্ষেপে সূর্য সেন নামে অধিক পরিচিত। তবে 'মাস্টারদা' নামে সহযোদ্ধাদের কাছে পরিচিত ছিলেন। তাঁর পিতার নাম রাজমণি সেন, মায়ের নাম শশীবালা সেন। তিনি ছিলেন পিতা-মাতার চতুর্থ সন্তান। পাঁচ বছর বয়সে পিতার মৃত্যুর পর, তাঁর বড় কাকা গৌরমণি সেনের কাছে প্রতিপালিত হয়েছেন। পরবর্তী সময়ে জ্যাঠাতুতো দাদা চন্দ্রনাথ সেন তাঁর অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করেন। ইনি প্রথমে চট্টগ্রাম কলেজে ও পরে পশ্চিমবঙ্গের বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে ভর্তি হন এবং এই কলেজ থেকে ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে বি এ পাস করেন। উল্লেখ্য এই কলেজের শিক্ষক সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী ছিলেন যুগান্তর দলের সদস্য। তিনি সূর্যসেনকে বিপ্লবী আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেন। চট্টগ্রামে ফিরে তিনি গণিতের শিক্ষক হিসেবে ওরিয়েন্টাল স্কুলে যোগ দেন। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে গান্ধীজি স্বরাজ এনে দেওয়ার জন্য বিপ্লবীদের কাছ থেকে এক বৎসর সময় চেয়ে নেন। তৎকালীন বিপ্লবীরা অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী না হলেও গান্ধীজির কথায় অনেকেই সহযোগিতা করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই অহিংস আন্দোলন এক বৎসরের ভিতর ভারতের স্বরাজ আনতে ব্যর্থ হলে, বিপ্লবীরা আবার সশস্ত্র বিপ্লবের পথ বেছে নেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় স্থানীয় জনগণের সহযোগিতায় সূর্য সেন একটি জাতীয় বিদ্যালয় গড়ে তোলেন। এই বিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষকতার কাজ শুরু করেন। এখানেই তিনি খ্যাত হন 'মাস্টারদা' নামে। এই বিদ্যালয় পরে তাঁর বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল।

সূর্য সেনের গ্রামের নাম ছিল নয়াপাড়া। পাশ দিয়েই বয়ে চলেছে কর্ণফুলী নদী। ১৮৯৪ সালের ২২ মার্চ জন্ম হয় তাঁর। পাঠশালার শিক্ষা শেষ করে ভর্তি হন নয়াপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে। আর সেখানেই ভাল লেগে গিয়েছিল মাস্টারমশাই হেমেন্দ্রবাবুকে। তিনি গলা ছেড়ে আবৃত্তি করতেন নবীনচন্দ্র সেনের দেশাত্মবোধক কবিতাগুলি। তাঁর ঘরের দেওয়ালে টাঙানো থাকত বিদ্যাসাগরের ছবি। সূর্য সেন পরে পড়তে এলেন চট্টগ্রাম শহরে। তৎকালীন ভারতের পূর্ব সীমান্তের অন্যতম প্রধান বন্দর, সিপাহি বিদ্রোহের সেপাইরা এই শহরের বুক চিরে এক সময় চলে গিয়েছিলেন ত্রিপুরার দিকে। ছাত্র সূর্যের হাতে আসে মরাঠি লেখক সখারাম গণেশ দেউস্করের 'দেশের কথা'। মন দিয়ে তখন তিনি পড়ছেন বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'। স্কুলের পাঠ শেষ করে ভর্তি হলেন কৃষ্ণনাথ কলেজে। ভাগীরথীর তীরে, জেলখানার পাশে কলেজ। অধ্যক্ষ শশিশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় পড়াতেন উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ। পড়ানো হত গিবন-এর 'দি ডিক্লাইন অ্যাণ্ড ফল অব দ্য রোমান এম্পায়ার'। পাশাপাশি তিনি পড়েন আয়ারল্যাণ্ডে বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাস, বিপ্লবী জন মিচেলের আত্মত্যাগের কাহিনি, ইস্টার বিদ্রোহের কথা। বন্ধুদের সঙ্গে ছুটে গেছেন বন্যাবিধ্বস্ত এলাকায়। ঝাঁপিয়ে পড়েছেন বন্যাত্রাণে। উমাতারা উচ্চ বিদ্যালয়ে এর পর তিনি শিক্ষক হিসাবে যোগ দিয়েছেন। ছাত্রদের মুখে মুখে হয়ে উঠেছেন, 'মাস্টারদা'। কিছু দিন পর গোটা ভারতে বিপ্লবী আন্দোলন কেমন চলছে, তা দেখার জন্য রওনা দেন গুয়াহাটির দিকে। বেশ কয়েক মাস অসমে কাটিয়ে লখনউ এসে যখন পৌঁছোন,

তখন উত্তর ভারতের বিপ্লবী আন্দোলন স্তিমিত হয়ে এসেছে। লখনউ থেকে কলকাতা, এসে উঠলেন ওয়েলিংটন স্কোয়ারের গোপন আস্তানায়। সেখানেই তাঁকে গ্রেফতার করা হল, ১৯২৬ সালের ৮ অক্টোবর। পাঠিয়ে দেওয়া হল রত্নগিরি জেলে। পাশেই আরব সাগর। সেই সময় 'ভারতী' তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'। শোভাবাজারের গুপ্ত আস্তানায় হ্যারিকেনের আলোয় রাত জেগে চলত 'পথের দাবী' পড়া। 'ভারতী' র জন্য থাকত সারা মাস ধরেই অপেক্ষা। রত্নগিরি জেলে বসে শরৎচন্দ্র ও তাঁর এই উপন্যাসের কথা খুব বলতেন মাস্টারদা। আর বলতেন, 'মহৎ সাহিত্য মনকে সজীব রাখে। ভালর প্রতি লোভ জন্মায় এ সব বই পড়ে।'

সালটা ১৯৩২, ধলঘাটের সাবিত্রী দেবীর বাড়িতে আত্মগোপন করে আছেন সূর্য সেন। একটু এগোলেই পুলিশ ক্যাম্প। রাত ছাড়া বাইরে বেরোনোর উপায় নেই। মে মাসের অসহ্য গরমে টিনের দোতলার অন্ধ কুঠুরিতে সারা দিন ছটফট করে কাটতে হয় তাঁকে। রাত দশটা বেজে গেছে। প্রীতিলতা এলেন। তাঁকে আগেই নির্মল সেন বলেছিলেন, ''মাস্টারদার সঙ্গে কথা বলো। এই মানুষটি কিন্তু অতল। ওঁর তল পাবে না। আমাদের মতো মানুষ ঢের পাবে। কিন্তু এঁর মতো পাবে না।'' আর রানিকে প্রথম দেখে মাস্টারদার মনে হয়েছিল, 'দেখলাম তাঁর মধ্যে অহঙ্কারের লেশমাত্র নেই। মনে হল, একজন ভক্তিমতী হিন্দুর মেনেয় হাতে প্রদীপ নিয়ে আরতি দেবার জন্য গিয়েছ রামকৃষ্ণের কাছে। আজ তোমার মুখে শুনব ওর কথা।'' ছোট বোন অমিতা, এই পরিচয় দিয়ে মৃত্যুপথযাত্রী বিপ্লবী রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে অনেক বার দেখা করেছিলেন প্রীতিলতা। রামকৃষ্ণের ফাঁসির পরই তিনি কলকাতা ছেড়ে চট্টগ্রাম ফিরে আসেন। মাস্টারদাকে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, 'মেয়েদের আপনারা দলে নিতে চাইতেন না কেন দাদা? তাঁরা কি দেশসেবার যোগ্য নন?'' মাস্টারদা জবাব দিয়েছিলেন, ''না, দেশ সেবার কঠিন কর্তব্য থেকে মেয়েদের বঞ্চিত করা চলে না। দেশসেবায় নরনারী ভেদ নেই।'' মাস্টারদার পাশে তখন রাখা আয়ারল্যাণ্ডের বিপ্লবী ড্যানিয়েল ব্রিন-এর সেই বিখ্যাত বই, 'মাই ফাইট ফর আইরিশ ফ্রিজম।' বইটা পড়ার জন্য হাতে তুলে নিয়েছিলেন প্রীতিলতা। মাস্টারদার নির্দেশেই রানি গৃহত্যাগ করেন। সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হয় সেই খবর, 'চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার ধলঘাটের শ্রীমতী প্রীতি ওয়াদ্দেদার গত ৫ জুলাই, মঙ্গলবার, চট্টগ্রাম শহর হইতে অন্তর্ধান করিয়াছেন। তাঁহার বয়স ১৯ বৎসর। পুলিশ তাঁহার সন্ধানের জন্য ব্যস্ত।' অন্তর্ধানের পর প্রীতিলতা ছিলেন পড়ৈকড়া দাতব্য হাসপাতালের চিকিৎসক হেমন্তকুমার ঘোষের বাড়িতে, তাঁর শালিকা পরিচয়ে। হেমন্তবাবুর বাড়ি থেকেই তিনি রওনা দেন সূর্য সেনের গোপন আস্তানার উদ্দেশে। মাস্টারদা রানি (প্রীতিলতা)কে বলেছিলেন, পলাতক এই জীবনে অনেক কষ্ট তোমায় সহ্য করতে হবে। রমণী চক্রবর্তীর বাড়িতে থাকার বন্দোবস্ত হয় প্রীতিলতার। ঠিক হয়, ১৯০২ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর, ইউরোপিয়ান ক্লাবে প্রীতিলতার নেতৃত্বেই আক্রমণ করা হবে। মাস্টারদার সে দিন মুসলমান চাষির বেশ। পরনে লুঙ্গি, কাঁধে গামছা, খালি গা। চলে যাওয়ার আগে প্রীতিলতা বলেছিলেন, 'আমি কিন্তু আর ফিরে আসব না দাদা। এক জনকে তো জীবন দিয়েই শুরু করতে হবে। মানুষ মনে করে, মেয়েরা অক্ষম, মেয়েরা দুর্বল। ভ্রান্ত এই ধারণা ছিন্ন করার সময় এসেছে। তা হলেই আমার বিশ্বাস, বাংলার বোনেরা দুর্বলতা ত্যাগ করবে, হাজারে হাজারে যোগ দেবে বিপ্লবী সংগ্রামে।' 'প্রীতিলতার মৃত্যুর পর সূর্য সেন লিখেছেন, 'সাজিয়ে দিয়ে যখন করুণভাবে বললাম, তোকে এই শেষ সাজিয়ে দিলাম। তোর দাদা তো তোকে জীবনে আর কোনোদিন সাজাবে না, তখন প্রতিমা একটু হেসেছিল। কী করুণ সে হাসিটুকু!'

শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করে সূর্য সেন চট্টগ্রাম শহরের দেওয়ান বাজার এলাকার ''উমাতারা'' উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ছিলেন নিরহঙ্কার, অনাড়ম্বর, বিনয়ী, স্বল্পভাষী ও নিরীহ প্রকৃতির মানুষ দৃঢ় চরিত্রের জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেন এবং সাধারণ ভাবে 'মাস্টার দা' নামে অধিক পরিচিত ছিলেন। ১৯১৯ সালের গোড়ার দিকে কানুনগো পাড়ার নগেন্দ্রনাথ দত্তের কন্যা পুষ্প কুন্তলার সঙ্গে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। শিক্ষকতার পাশাপাশি সূর্য সেন চট্টগ্রামের বিপ্লবী কর্মী অনুরূপ সেন, চারু বিকাশ দত্ত, অম্বিকা চক্রবর্তী, নগেন্দ্রনাথ সেন প্রমুখের সঙ্গে গোপন বিপ্লবী দল গঠনের কাজ শুরু করেন। দুরদর্শিতা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞাবলে তিনি কিছুদিনের মধ্যেই দলের নেতা হিসাবে স্বীকৃত হন। দেশের স্বাধীনতার জন্য বিপ্লবী সূর্য সেন প্রত্যক্ষ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। বাঙালির মুক্তির সংগ্রামে

তিনি ছেড়ে দেন শিক্ষকতা। ছেড়ে দিলেন সংসার, হলেন সর্ব ত্যাগী, মুক্তির সাধক, বিপ্লবী তরুণ সমাজের সর্বাধিনায়ক। ১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে সূর্য সেন যুবকদের বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। কিছু দিন পর গান্ধীজি অহিংস আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলে সূর্য সেন অস্ত্র ক্রয়ের উদ্দেশ্যে বিপ্লবীদের অর্থ সংগ্রহের নির্দ্দেশ দেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯২৩ সালের ১৩ ডিসেম্বর তাঁরই নির্দেশে অনন্ত সিংহ, দেবেন দে ও নির্মল সেন চট্টগ্রাম শহরের উপকণ্ঠে পাহাড় তলিতে অবস্থিত 'আসাম বেঙ্গল' রেলওয়ে কোম্পানির কারখানার কর্মচারীদের বেতন ভাতার সতেরো হাজার টাকা ছিনতাই করেন।

এর কিছুদিন পর পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সূর্য সেনের আস্তানায় হানা দিলে উভয় পক্ষের মধ্যে একখণ্ড যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধ 'নগর খানা পাহাড় খণ্ড যুদ্ধ' নামে ইতিহাসে পরিচিত। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে শারীরিক সার্মথ্য হারিয়ে সূর্য সেন ও অম্বিকা চক্রবর্তী বিষ পান করে আত্মহত্যার পথ বেছে নেন। কিন্তু বিষক্রিয়া তীব্র না হওয়ার তাঁরা উভয়েই সে যাত্রায় বেঁচে যান এবং গ্রেপ্তার হন। তবে বিচারে তাঁদের কোন অপরাধ প্রমাণিত না হওয়ায় তাঁরা অচিরেই মুক্তি লাভ করেন। ১৯২৬ সালে সূর্য সেন টের্গাট হত্যা প্রচেষ্টার দায়ে গ্রেপ্তার হয়ে কারা ভোগ করেন এবং ১৯২৮ সালে বোম্বাইয়ের 'রত্নগিরি জেল' থেকে মুক্তি পান। ১৯২৮ -এর ডিসেম্বর, কলকাতার পার্ক সার্কাস ময়দানে বসল জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক সুভাষচন্দ্র বসু। মাস্টারদার নেতৃত্বে চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা একযোগে দাঁড়ালেন সুভাষচন্দ্রের পক্ষে। ১৯২৯ সালের গোড়ার দিকে সূর্য সেন চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন এবং ঐ বছরই তাঁরই নেতৃত্বে চট্টগ্রামে চারটি বড় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তন্মধ্যে জেলা যুব সম্মেলনটি উদ্বোধন করেন নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু। ৬৪ দিন অনশনের পর বিপ্লবী যতীন দাসের মৃত্যু হলে, আইরিশ রিপাবলিকান আর্মির আদলে চট্টগ্রামে গড়ে তোলা হল ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি। ১৯৩০ সালে চট্টগ্রামের যুব বিদ্রোহের পরিকল্পনা করেন মাস্টারদা। প্রধান দুটি শত্রু ঘাঁটি, 'অগজিলিয়ারি ফোর্স'-এর অস্ত্রাগার এবং পুলিশ লাইনের অস্ত্রাগার দখলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। যোগ দিয়েছিলেন মোট ৭৩ জন বিপ্লবী। জালালাবাদ পাহাড়ে এই বিপ্লবীদের সংগ্রাম ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। এর পরেই মাস্টারদার সঙ্গে যোগ দেন কল্পনা দত্ত ও প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। ততদিনে ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করেছে, সূর্য সেনকে জীবিত বা মৃত ধরে দিতে পারলে দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। ধরা পড়ার পর তাঁর ওপর অমানুষিক অত্যাচার চালানো হয়েছিল।

জেলে মাস্টারদার সঙ্গী ছিল পাঁচটি বই। 'গীতা', 'চণ্ডী', 'মহাভারত', 'শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' আর রবীন্দ্রনাথের 'চয়নিকা'। খুব ভোরে উঠে ব্রহ্মসঙ্গীত গাইতেন বা স্তোত্রপাঠ করতেন। সকাল কেটে যেত গীতা পাঠে, দুপুরে পড়তেন মহাভারত। তাঁর চিঠিগুলি থেকে জানা যায়, প্রায় এগারো মাস জেলে থাকার পর তাঁর ফাঁসির রায় বেরোয়। জেলে থাকাকালীন তাঁর সঙ্গে বাড়ির লোকের দেখা করার অনুমতি দেয়নি ব্রিটিশ। ফাঁসির পরেও তাঁর দেহ দেখতে পেলেন না কেউ। ১৯০৪ সালের ১২ জানুয়ারী ফাঁসি হল সূর্য সেনের। জীবনের শেষ দিনগুলিতে মাঝে মাঝে মৃত্যুচিন্তা করতেন তিনি। এক চিঠিতে লিখেছেন, 'দার্শনিক এবং কবিরা মরণ জিনিসটাকে কত সুন্দরভাবে চিত্রিত করেছেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, মানুষ যেমন জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করে নতুন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেরূপ আত্মা জীর্ণ শরীর ত্যাগ করে অন্য নতু ন দেহ ধারণ করে। কবি বলছেন, ''মরণ রে, তুঁহু মম শ্যাম সমান।'' মানুষ এত সুন্দর লেখা পড়েও উপলব্ধি করতে পারে না বলেই কি মৃত্যুকে ভয়ের জিনিস বলে মনে করে?' জীবনের শেষ দিকে এক চিঠিতে, সব শারীরিক যন্ত্রণা তুচ্ছ করে সূর্য সেন লিখেছিলেন, 'চার-পাঁচ দিন আগে একদিন সন্ধ্যার সময় একদৃষ্টে একমনে আকাশের দিকে চেয়েছিলাম। নির্মল জ্যোৎস্নায় সমস্ত নীল আকাশ ভরে গিয়েছিল। অসংখ্য নক্ষত্র সুন্দর ফুলের মতো সারা আকাশে ফুটে রয়েছিল। গাছগুলি নীরবে যেন প্রকৃতির এই বিমল সৌন্দর্যের মধ্যে ডুবে গেল। মনে পড়ে গেল তাঁর কথা, যিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন, যিনি আমাদের জন্য প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্যের ভাণ্ডার খুলে রেখেছেন।... মৃত্যু আমার দরজায় করাঘাত করছে। মন আমার অসীমের পানে ছুটে চলেছে।' জাতির ইতিহাসে শহীদ সূর্য সেন অমর অক্ষয়। অবিভক্ত বাংলার মুক্তির বিপ্লবের ইতিহাসে আজও তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী বীর।

কাবা হিন্দু মন্দির কেন ধ্বংস হল

অমলেশ মিশ্র

ইসলাম অনুসারে আল্লাহ্ তাঁর নবীর মাধ্যমে কাজ করেন। কোরান তাঁর বাণী এবং নবীর মাধ্যমে তাঁর কাজ। Allah acts in the life style of Muhammad এবং সেটাই সুন্নাহ্। মুসলমান মাত্রেই নবীর জীবনশৈলী অর্থাৎ সুন্নাহ্ মেনে চলবেন। **সমস্ত ইসলামী তাত্ত্বিকরাই বলেন—মুসলমানদের 'আক্কেল' দরকার নাই, 'নকল' দরকার। Muslims should not use their AQL (Reason); all they need is NAQL (imitation).**

আল্লাহ্ এবং এই পছন্দ করা জনগোষ্ঠীর সঙ্গে যে 'মিশাক' বা চুক্তি হয়েছে তাহল উম্মৎ ই-মহম্মদ কেবলমাত্র আল্লারই উপাসনা প্রচলিত করবে—যারা তা করবে না বা করছে না তাদেরকে তা করতে বাধ্য করবে। তাদের ধর্মান্তরিত করবে, দাস বানাবে বা হত্যা করবে। এর আগে ইহুদীদের সঙ্গে যে চুক্তি হয়েছে— উম্মৎ-ই-ইব্রাহেমি এবং ইসার সঙ্গে যে চুক্তি হয়েছিল উম্মৎ-ই-ঈসা-সেগুলি এখন বাতিল হল। এখন থেকে একমাত্র মুসলমানরাই বিশ্বে রাজত্ব করার অধিকার পেল এবং বিশ্বের সমস্ত সম্পত্তিতে তাদেরই অধিকার বর্তাল।

আগের দুটি চুক্তির (উম্মত্-উ-ইব্রাহিমি এবং উম্মৎ-ই-ঈসা) সঙ্গে উম্মৎ- ই-মহম্মদের একটি মাত্র পার্থক্য আছে। আগের দুটি চুক্তিতে 'লুঠ' (Plunder) অনুমোদিত ছিল না। কিন্তু উম্মৎ-ই-মহম্মদীতে তা অনুমোদিত ও ন্যায্য হিসাবে পরিগণিত হল।

যাঁরা কলেমা পড়েন এবং বলেন---লা ইলাহা-ইল্লাল্লা-মহম্মদুর রসুলাল্লাহ্-(আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ঈশ্বর নাই, মহম্মদ হলেন নবী বা রসুল) তাঁরা 'মুমিন' অর্থাৎ 'বিশ্বাসী'। বাকী সকলেই কাফির অর্থাৎ অবিশ্বাসী। যে দেশ ও জমিগুলি মুমিনদের শাসনে রয়েছে সেগুলি দার-উল-সালাম বা শান্তির জমি (দেশ)। যে জমি বা দেশগুলি কাফিরদের শাসনে আছে—সেগুলি দার-উল-হার্ব্ অর্থাৎ যুদ্ধ ক্ষেত্র, অশান্তির দেশ। এই সব জমিতে বা দেশে মুসলমানরা তাদের তরবারি ব্যবহার করবে। এই ভাবে কাফির দেশের বিরুদ্ধে মুমিনদের জেহাদ বা ধর্মযুদ্ধ একটি চিরস্থায়ী অনুষঙ্গ। আল্লাহ্ কেবল মাত্র মুসলমানদেরই পালনকর্তা, দুনিয়ার নয়।

ইসলামপূর্ব আরবে বহু দেবদেবীর উপাসনা প্রচলিত ছিল। সাধারণত বহু দেবদেবীতে যাঁরা বিশ্বাস করেন তাঁরা ধর্মমতের দিক থেকে উদার হয়ে থাকেন। ইসলাম পূর্ব আরবে ইহুদী এবং খ্রিস্টানরা একপ্রকার নিশ্চিন্তে বসবাস করতেন যদিও ঐ দু'টি মতই একেশ্বরবাদী এবং অসহিষ্ণু। আরবীয়রা বহু বিষয়েই উন্নত ছিলেন। আরবে হিন্দুদেরও প্রচুর আনাগোনা ছিল ব্যবসা বাণিজ্যের কারণে।

কোনও দেশের সমাজ ও সংস্কৃতি বুঝতে হলে, সেদেশের মহিলাদের মর্যাদা সম্পর্কে জানতে হয়। ইসলামপূর্ব আরবে অনেক দেবদেবী ছিলেন। তাঁদের ধর্ম বিশ্বাসের সঙ্গে দেবী যুক্ত থাকায় মহিলাদের সম্মানের স্থানে রাখা হত। মহম্মদের প্রথম স্ত্রী খাদিজা বিবির দিকেই দেখুন। ধনী মহিলা, নিজের বিচার বুদ্ধি ব্যবহার করে নিজেই নিজের ব্যবসা পত্র সামলাতেন। তাঁর স্বাধীনভাবে জীবনযাপনের কোনও অসুবিধা ছিল না। তাঁর বৈধব্যের কালে তাকে বিবাহ করার প্রস্তাব তো অনেকেই দিয়েছিলেন। কিন্তু তা প্রত্যাখান করার মত সামাজিক ও ধর্মীয় সুবিধে তাঁর ছিল। এ ছাড়াও আরও উদাহরণ পাওয়া যায়। যেমন আবু-সুফিয়ান-এর স্ত্রী-হিন্দু। ঐস্লামিকরা নিজেদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য প্রচার করেন-আহেলিয়া-জাহালিয়ৎ। অর্থাৎ ইসলাম আসার পূর্বে আরব ছিল অন্ধকার দেশ। এটি একটি বহুপ্রচারিত মিথ্যা। আরব কখনও অন্ধকার ছিল না। মহম্মদের

একশ্বরবাদী ইসলাম কায়েম হলে বহুদেববাদীদের বল প্রয়োগ করে একেশ্বরবাদী করা হয়েছিল এবং ইহুদীদের আরব থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল।

আরবীয়রা বহু দেবদেবীর পূজা করত। তাঁদের মধ্যে আল্-লা ছিলেন খুবই মহিমাময় দেবতা। ইসলামের ধর্মগ্রন্থ কোরানেও (১৩.১৭; ২৯.৬১; ৪১.২৪, ৩৯.৩৯ প্রভৃতি) আল্লাকে খুব উঁচু স্থানে রাখা হয়েছে। তবে তাঁকে কেউ ভয় পেত না। আল-লা কে ভয় করার শিক্ষা মহম্মদই দিয়েছেন।

উল্লেখ করার বিষয় হল-কাবা মন্দিরে অনেক দেবদেবীর উপস্থিতি থাকলেও —আল-লা নামে কোনও মূর্তির উপস্থিতির খবর পাওয়া যায় না। এর একটাই কারণ হতে পারে, তা হল সব দেবদেবীই আল-লার এক একটি রূপ। তাই যে কোনও একটির মাধ্যমেই আল্-লার পূজা বা উপাসনা করা যায়। মূর্তিবাদী আরবীয়রা সব সময় সব ব্যাপারেই আল্-লার উপস্থিতি অনুভব করতো। পরে মহম্মদ তাদের শিখালেন যে কেবল মাত্র শেষ বিচারের দিনই আল্-লা তাদের দেখতে আসবেন।

ইসলামপূর্ব আরবে যে সকল দেবদেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়, তাঁরা হলেন,

* আল্-মালিক—

* বা-আল্—

* এল-আবদিন-এল

* ওয়াবেল এল

* আল্-লাত্ —সূর্য দেবতা

* আল-মানাৎ—

* আল্-উজ্জা

* শামস্

* ধূস্-সারা

* অবল-খুবাইয়া

* কূঝা

* ওয়াদ

* রুদা

* জাড্

* সাড্

* সালাফ

* তখউফ্

* হুবাল

* আল-কোয়াইস্

* আল-উকাইশির

* সাই-আল-কুয়াম

এবং আরও কয়েকজন দেবদেবী ছিলেন এবং আরবীয়রা তাঁদের পূজা করতেন।

মহম্মদ-এর আবির্ভাবের আগেই আরব দেশটিতে ইহুদী এবং খ্রিস্টানরা বেশ প্রভাব ফেলেছিল। ফলে আরবীয়দের বহু দেবদেবীর ধারণায় ইহুদী ও খ্রিস্টানদের একেশ্বরবাদ আঘাত করছিল।

মহম্মদ তাঁর সময়ে ইহুদী ও খ্রিস্টান মতবাদকে উৎখাত করেছিলেন আরব থেকে। যদিও ইসলামের মতো ও দু'টিও একেশ্বরবাদী রিলিজিয়ন, ওদেরও রসুল আছেন, ওদেরও পবিত্র গ্রন্থ আছে, তবু মহম্মদ জানালেন যে ওগুলি এখন আর চলবে না। মোজেস্ ও ঈশার স্থলে এখন আরও শক্তিশালী নবী এসে গেছেন। অতএব দেবদেবীপূজক আরবীয়দের তো বটেই , এমন কি ইহুদী ও খ্রিস্টানদেরকেও ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হতে হবে।

মহম্মদ আরও জানালেন যে রক্তের সম্পর্কের থেকে আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস বড়। জানা যায় যে অনুচরদের একজন আল্লাতে তার বিশ্বাস প্রমাণ করার জন্য তার বাবারও মুন্ডচ্ছেদ করেছিল। ইসলাম প্রচারিত হওয়ার আগেও আরবে একশ্বরবাদী ইহুদী এবং খ্রিস্টানরা ছিলেন।

আমাদের আলোচনা হচ্ছিল যে হিন্দু বা অন্য দেবদেবীতে বিশ্বাসী মানুষদের দেবমূর্তি ও দেবালয় ধ্বংস করা ইসলামের একটি অবশ্যকরণীয় কাজ এবং সে সঙ্গে করণীয় হল ভগ্ন দেবালয়ের উপাদান নিয়ে আল্লাহ্‌র আলয় অর্থাৎ মসজিদ নির্মাণ করা।

এ সূত্রে আমরা মক্কার কাবা মন্দিরের প্রসঙ্গে আসতে পারি। যদিও কেউ কেউ দাবি করেছেন যে কাবা মন্দির ছিল একটি মহাদেব

মন্দির, কিন্তু তা মেনে না নিলেও একথা নিশ্চিত সত্য যে কাবা একটি দেবালয় ছিল এবং সেখানে ৩৬০ টি নানা রকমের দেবদেবী মূর্তি ছিল।

এই সূত্রে বলা প্রয়োজন যে-মহম্মদের মক্কা বিজয় .ইসলামের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা প্রধান তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এই বিজয় ইসলামের চরিত্র স্থির করেছিল—

(১) মুসলিমরা বিজয় না পাওয়া পর্যন্ত সংঘর্ষ ও যুদ্ধ করে যাবে যে কোনও অজুহাতে ও

(২) ইসলাম দ্বিতীয় কোন ধর্মমতকে স্বীকার করবে না—অন্য কোনও সংস্কৃতির সঙ্গে মিলে মিশে থাকবে না এবং প্রথম সুযোগেই অপরটিকে ধ্বংস করে মুছে দেবে—যাতে একমাত্র ইসলামই সর্বত্র রাজ করতে পারে।

কাবা মন্দিরকে মসজিদে রূপান্তরিত করার কাজটি ঐ দ্বিতীয় চরিত্রের অন্তর্ভূক্ত। শুধু কাবা নয়—ভারতে মুসলমানদের মূর্তি ও মন্দির ধ্বংস করার কাজটি ঐ দ্বিতীয় চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত। বাবর থেকে ঔরঙ্গজেব পর্যন্ত সম্রাটরা, নবাবরা, সুলতানরা, মুসলমান সেনাপতিরা যা করেছেন তা সবই ইসলাম মেনেই করেছেন। ইসলাম পূর্ববর্তী কোনও সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে, কোনও ধর্ম বিশ্বাসকে তারা পৃথিবীতে থাকতে দেবে না। বিভিন্ন দেশে তারা একাজ করেছে এবং সফল হয়েছে। ব্যর্থ হয়েছে একমাত্র ভারতবর্ষে। মুসলমানরা এদেশে ধ্বংস করেছে মূর্তি-মন্দির, হত্যা করেছে লক্ষ লক্ষ মানুষকে তবুও ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিকে তাদের ধর্মীয় নির্দেশ মত লুপ্ত করতে পারেনি।

মক্কা বিজয়ের পরেই মহম্মদ কাবায় গেলেন। উথমান-বিন-তালার কাছ থেকে চাবি নিলেন ও প্রবেশ করলেন। ঢুকেই কাঠের তৈরী একটি ঘুঘু পাখী দেখলেন। সেটিকে নিজের হাতে ভেঙ্গে ছুঁড়ে দিলেন। ৩৬০ টি মূর্তি ছিল। মহম্মদ একটি লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বললেন, সত্য আবির্ভূত হয়েছে, মিথ্যার আর কোনও স্থান নাই। ''আর ঘোষণা কর-'সত্য আসিয়া গিয়াছে, বাতিল নির্মূল হইয়াছে। বাতিল তো ক্ষয়মানই।" সূরা বনী ইস্রাইল (১৭.৮১. কোরান মজিদ) এই কথা বলে তিনি এক একটি মূর্তির দিকে হাতের লাঠি দেখালেন। মূর্তি ভেঙ্গে পড়ে গেল। **দুপুরের নামাজের সময় তিনি বললেন—সব মূর্তি এক জায়গায় জমা করে আগুনে পুড়িয়ে দাও। দেওয়ালে অনেক ছবি ছিল। কেবল যীশু ও তাঁর মাতা মেরীর ছবি ব্যতীত অন্যগুলিও পোড়ানো হল।** সব থেকে বড় মূর্তিটি ছিল দেবতা হুবল-এর। সেটিকে মসজিদের সিঁড়ি করা হল—যাতে বিশ্বাসীরা তাকে পদপিষ্ট করে নামাজ-এ যেতে পারেন।

কেবল একটি মাত্র মূর্তিকে মহম্মদ ধ্বংস করলেন না—চুম্বন করলেন। যার ফলে যে মুসলমান হজ করতে কাবা মসজিদ যান তিনি এই পাথরটিকে চুম্বন করেন। এটি হজ যাত্রীর অবশ্যকরণীয়। হজযাত্রীরা সকলে ঐ পাথর-এর কাছে যেতে পারে না ভিড়ের কারণে। তারা ঐ পাথরের সঙ্গে স্পর্শ করা যে কোনও দণ্ডকেই চুম্বন করে তৃপ্ত হয়। এই পাথরটি বলা হয়-আল্-হাজার বা আল-আসোয়াদ। মহম্মদের কথায় ঐ পাথর বেহেশ্‌ত্‌ থেকে এসেছে-পৃথিবীর শেষ দিনে সে ফিরে যাবে। সেদিন তার দুটি চোখ হবে- সে দেখতে পাবে, জিহ্বা হবে-সে কথা বলবে এবং কারা তাকে নিষ্ঠার সঙ্গে চুম্বন করেছে সে তা দেখে নেবে।

কয়েক বছর পরে **খলিফা ওমর (৬৩২-৬৪৪ খ্রিঃ) ঐ কালো পাথর চুম্বন করার সময় নাকি বলেছিলেন—আমি জানি যে তুমি একটি পাথর মাত্র—যে সাহায্যও করতে পারে না, ক্ষতিও করতে পারে না। নবীকে যদি তোমাকে চুম্বন করতে না দেখতাম, আমি তোমাকে চুম্বন করতাম না (পৃঃ ৪০৮ Hindu Temples..... Sitaram Goel**)।

কাবা গৃহ দু'বার ধ্বংস হয় ও দুবার পুনর্নির্মিত হয়। হারুন উর্ রসিদ খলিফা হয়ে তৃতীয় বার কাবা ভাঙ্গতে উদ্যত হলেন বেং এ বিষয়ে ইমাম মালেকের পরামর্শ চাইলেন। ইমাম মালেক তাঁকে বলেছিলেন---কাবা যেমন আছে তেমন থাকতে দাও—এটিকে খেলার বস্তুতে রূপান্তর কোরো না। এই পরামর্শ শুনে খলিফা হারুন-উর্-রসিদ নিবৃত্ত হলেন। কাবা প্রথম পুনর্নির্মাণ করেন আবদুল্লা-বিন-জুবেইর এবং দ্বিতীয় বার পুনর্নির্মাণ করেন-হজ্জাজ-বিন-ইউসুফ।

অতঃপর মক্কায় যত দেবদেবীর মন্দির ছিল মহম্মদের নির্দেশে সবগুলিই মূর্তি সহ ধ্বংস করা হয়। ■

রামমন্দির সচেতন সমাজেরও প্রতীক

সৌগত বসু

২০১৯ এর ৯ই নভেম্বর এ দেশের বিচার ব্যবস্থার ইতিহাসের এক অন্যতম উল্লেখযোগ্য দিন। সেদিনই ভারতের সর্বোচ্চ আদালতে সুষ্ঠু সর্বজনমানীত মীমাংসা হয়েছিল প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী যাবৎ বিচার ব্যবস্থার অলিগলি থেকে রাজপথে ঘুরতে থাকা এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মামলার ১৩৪ বছর আগে ব্রিটিশ আমলে যার সূত্রপাত। যদিও তারও অনেক অনেক আগে থেকে এই মামলার মূলগত বিষয়ের সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ছিল আসমুদ্রহিমাচল ভারতের কোটি কোটি মানুষের বিশ্বাস, আস্থা, ভাবাবেগ, ত্যাগ, তিতিক্ষা আর আত্মমর্যাদা। তা সত্ত্বেও বিভিন্ন সময়ে সমাজের বিভিন্ন অংশের—এমনকি অনেক সময়ে কেন্দ্রীয় আর প্রাদেশিক সরকারেরও—প্রত্যক্ষ আর পরোক্ষ অসহযোগিতা আর বিরোধিতার মাঝে আটকে ছিল এই মামলার সত্যনিষ্ঠ সমাধান। অবশেষে ২০১৯-এর প্রায় শেষে এসে এ দেশের বিচার ব্যবস্থার ইতিহাসে, সময়ের নিরিখে অন্যতম দীর্ঘ মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করেছিলেন ভারতের মহামান্য সর্বোচ্চ আদালতের তৎকালীন প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন পাঁচ বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। আইনের খুঁটিনাটি সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান সমাজের বেশিরভাগ মানুষেরই নেই। আর সেটাই হয়তো স্বাভাবিক। যদিও এটা বুঝতে কারো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়, যে অনেকগুলো কারণে এই রায় আক্ষরিক অর্থেই ঐতিহাসিক। তার মধ্যে অন্যতম হলো সেদিন ভারতের সর্বোচ্চ আদালতের পাঁচ বিচারপতির সিদ্ধান্ত ছিল সর্বসম্মত। শুধু তাই নয়। আদালতের আর পাঁচটা রায়ের মতো এই রায় কোন বিচারপতি লিপিবদ্ধ করেছেন নির্দিষ্ট করে তার কোনও উল্লেখ এই রায়ে ছিল না। অর্থাৎ মহামান্য সর্বোচ্চ আদালতের সেই পাঁচজন বিচারপতির প্রত্যেকে এই ঐতিহাসিক মামলার চূড়ান্ত রায়ের প্রতিটা শব্দের দায়িত্ব সমান ভাবে গ্রহণ করেছিলেন। শুধু এই আইনী বিবাদের সুষ্ঠু মীমাংসাই নয় সেদিন ভারতের সর্বোচ্চ আদালতে একই সাথে সুরক্ষিত আর সমাদৃত হয়েছিল ভারতীয়দের বেশ কয়েকটা প্রজন্মের কোটি কোটি মানুষের বিশ্বাস, আস্থা, ভাবাবেগ, ত্যাগ, তিতিক্ষা আর আত্মমর্যাদা।

এর ঠিক দিন কুড়ি পরে নভেম্বরের ২৯ তারিখ তামিলনাড়ুর ''শাস্ত্রা ইউনিভার্সিটির'' এক অনুষ্ঠানে এই বিষয়েই বক্তব্য রাখছিলেন স্বামীনাথন গুরুমূর্তি। তামিল ভাষায়র 'তুঘলক' সহ আরো বেশ ক'খানা হিন্দী আর ইংরাজী পত্রিকার সম্পাদক, স্বনামধন্য সাংবাদিক, প্রথিতযশা লেখক তথা প্রাবন্ধিক, পেশায় চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট, রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক বিষয়ে এ দেশের অন্যতম সেরা বিশেষজ্ঞ এবং আরো অনেক পরিচয়ে সুপরিচিত পণ্ডিত এক মানুষ। সেদিন গুরুমূর্তির ভাষণের প্রতিটা শব্দ থেকে মুগ্ধতা, প্রশংসা, শ্রদ্ধা আর কৃতজ্ঞতা ঝরে পড়ছিল সেই সময়ে প্রায় ৯২ বছর বয়সের এক নবতিপর প্রথিতযশা আইনজ্ঞের উদ্দেশ্যে। তিনি **কেশব পরাশরণ। গত শতাব্দীর ৮০-এর দশকের প্রায় পুরোটা জুড়ে যিনি তাঁর সুযোগ্য হাতে সুনামের সাথে প্রথমে সামলেছিলেন ভারতের সলিসিটর জেনারেলের আর পরে অ্যাটর্নি জেনারেলের দায়িত্ব। তারও আগে ৭০-এর দশকে সাফল্যের সাথে সামলেছেন তামিলনাড়ুর অ্যাডভোকেট জেনারেলের দায়িত্ব। ২০০৩-এ ভারত সরকার তাঁকে সম্মানিত করেছেন পদ্মভূষণ আর ২০১১-তে পদ্মবিভূষণে। ২০১৯-এর ৯ই নভেম্বর ভারতের সর্বোচ্চ আদালত যে ঐতিহাসিক মামলায় যুগান্তকারী এবং চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করেছিলেন-সেই মামলায় ''রাম লালার'' মর্যাদা রক্ষার্থে, তাঁর পক্ষে আইনজ্ঞদের যে দল অক্লান্ত, সফল ও সার্থক লড়াই লড়েছিলেন—কেশব পরাশরণ ছিলেন সেই আইনজ্ঞদের দলের কাণ্ডারী।**

পেশাগত ভাবে স্বামীনাথন গুরুমূর্তি যদিও নিজে উকিল নন, তা সত্ত্বেও অর্থনীতি, হিসাবশাস্ত্র, রাজনীতি, আইন সহ বহুমুখী বিষয়ে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য আর বিপুল অভিজ্ঞতা তাঁকে নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ আর ঐতিহাসিক মামলায় দেশের সেরা আইনজ্ঞদের সহযোগী, সহকর্মী তথা সহযোদ্ধা হিসেবে যুক্ত থাকার সুযোগ করে দিয়েছে বহুবার। আর সেই সূত্রে তিনিও সঞ্চয় করেছেন বিপুল আর দুর্লভ সব অভিজ্ঞতা। রাম জন্মভূমি পুনরুদ্ধার আন্দোলনের একজন সক্রিয় সদস্য গুরুমূর্তি এই ঐতিহাসিক মামলার সাথেও ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন। আর তাঁর ঈর্ষণীয় বিপুল অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই সেদিন নিজের ভাষণে গুরুমূর্তি বলেছিলেন—শুধুমাত্র আইনের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে মূল্যায়ন করলে দেখা যাবে এই মামলা লড়ার মতন যোগ্যতা হয়তো দেশের অনেক আইনজীবীরই ছিল এবং আছে। কিন্তু শুধুই অর্থমূল্যের বিনিময়ে কোনও লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবী আদালতে সওয়াল করবেন—এ মামলা আদৌ সেই ধরমের ছিল না। এই ঐতিহাসিক মামলা আর তার চূড়ান্ত রায়কে সেদিন তিনি অভিহিত করেছিলেন 'ন ভূতঃ ন ভবিষ্যতি' এই শব্দবন্ধ ব্যবহার করে। এমন ঘটনা বিরলের মধ্যে বিরলতম। যা অতীতে কখনও

ঘটেনি—ভবিষ্যতেও আর কখনও ঘটবে না। গুরুমূর্তির মতে ভারতের বিচার ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটানো, আক্ষরিক অর্থেই ঐতিহাসিক আর যুগান্তকারী এমন এক মামলার সাফল্য পেতে প্রয়োজন ছিল আইনের সর্বোচ্চ স্তরের ব্যুৎপত্তি। কিন্তু সাথে প্রয়োজন ছিল তার থেকেও আরও অনেক বেশী কিছুর। আইনের বিষয়ে তাঁর প্রশ্নাতীত ব্যুৎপত্তির সাথে নিষ্ঠা, আন্তরিকতা আর প্রজ্ঞার মেলবন্ধনে ভারতের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ আর অন্তরাত্মার যে নির্যাস কেশব পরাশরণ এই মামলায় দেশের সর্বোচ্চ আদালতে উপস্থাপন করেছেন তা অন্য কোনো পক্ষে হয়তো তেমন সুচারু ভাবে সম্ভব ছিল না।

স্বামীনাথন গুরুমূর্তি সেদিন অকপটে বলেছিলেন—টেলিভিশনের পর্দায় যখন সর্বোচ্চ আদালতের এই ঐতিহাসিক রায়ের খবর সম্প্রচার হচ্ছিল সেই সময়ে আবেগে, আনন্দে তাঁর পরিবারের সকলের চোখে ছিল জল। সেই সময়েই তাঁর সহধর্মিণী জানিয়েছিলেন তিনি কেশব পরাশরণকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে কৃতজ্ঞতা জানাতে চান। গুরুমূর্তি যেন তাঁকে সেই সুযোগ করে দেন। এই মামলার মূলগত বিষয় নিয়ে আসমুদ্রহিমাচল প্রায় প্রতিটা ভারতীয় পরিবারে আত্মমর্যাদা আর আবেগের উপস্থিতি কত গভীরে তো বোঝাতে গিয়ে তার শ্রোতাদের নিজের পরিবারের আর সহধর্মিণীর উদাহরণ তুলে ধরেছিলেন পোড় খাওয়ার গুরুমূর্তি। সেদিন তাঁর প্রতিটা শব্দ এঁকে দিয়েছিল ভারতের বৃহত্তর সমাজের এক নির্ভুল চিত্র। আদতে অভূতপূর্ব এই আন্দোলন আর তার সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত এই মামলা শুধুমাত্র মন্দির পুনর্নির্মাণের বিষয় ছিল না। ছিল এই পৃথিবীতে এখনও বতর্মান অন্যতম প্রাচীন সভ্যতার কোটি কোটি ধারক আর বাহকদের আত্মমর্যাদা আর অতীত গৌরব রক্ষার সতস্ফূর্ত আকুলতা। ছিল ইতিহাস তাদের উপর যে অপমান, যে গ্লানির বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিল তা ঝেড়ে ফেলে আবার ঋজু হয়ে উঠে দাঁড়ানোর সংগ্রাম। আর এমনটা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল হলেও এর আগেও ঘটেছে।

১৯৬৩ সালে ভারতীয় বিদ্যা ভবন আয়োজন করেছিল মৌলানা আজাদ মেমোরিয়াল লেকচারের। সেই বক্তৃতা দিয়েছিলেন পৃথিবী বিখ্যাত ঐতিহাসিক স্যার আর্নল্ড জোসেফ টয়েনবী। টয়েনবী ছিলেন ব্রিটিশ আর একজন আদ্যন্ত পেশাদার ঐতিহাসিক। ভারতীয় কৃষ্টি, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ নিয়ে তাঁর কোনও আত্মিক টান থাকার কথা নয়। স্বাভাবিক ভাবেই ছিলও না। যদিও আর্নল্ড টয়েনবী নিজের বক্তৃতায় সেদিন যে কথা বলেছিলেন তার বছর তিনেক আগে ১৯৬০ সালে প্রথমবার প্রকাশিত তার বিখ্যাত বই ‘‘ওয়ান ওয়ার্ল্ড এণ্ড ইণ্ডিয়া”-এর ৫৯-৬০ পৃষ্ঠায় সে কথা তিনি লিখেছিলেন। সেদিন টয়েনবী বলেছিলেন ভারতের মাটিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে নিজের দীর্ঘদিন আগের এক অভিজ্ঞতার স্মৃতি তাঁর চোখের সামনে আবারও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সেই স্মৃতি পোল্যাণ্ডের রাজধানী শহর ওয়ারসা-র। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষের কিছু পরে ১৯২০-এর দশকে সেখানে গিয়েছিলেন টয়েনবী। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ১৮১৫-তে প্রথমবার পোল্যাণ্ড দখল করে সেখানে তাদের প্রভুত্ব কায়েম করতে সফল হয়েছিল রাশিয়া। তার পরের কয়েক দশকে বেশ ক’বার পোল্যাণ্ডের মানুষদের স্বাধীনতা যুদ্ধ সমর শক্তি দিয়ে দমন করেছিল সেখানকার রাশিয়ান শাসকেরা। কোনও ধর্মীয় ভাবাবেগ থেকেনয় বরং সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে। **উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে শুরু করে প্রায় পঁচিশ বছর ধরে ওয়ারসা-র প্রাণ কেন্দ্রে পোল্যাণ্ডের রাশিয়ান শাসকেরা তাদের নিজেদের সংস্কৃতি আর ঐতিহ্যের চিহ্নস্বরূপ গড়ে তুলেছিল জাঁকজমকপূর্ণ এক অতিকায় ‘‘ইস্টার্ন অর্থোডিক্স খ্রিস্টান ক্যাথেড্রাল”। যে গীর্জা সেই সময়ে হয়ে দাঁড়িয়েছিল একদা (রাশিয়ান আগ্রাসনের আগে) ‘‘রোমান ক্যাথলিক খ্রিস্টান রাষ্ট্র” পোল্যাণ্ডের রাজধানী শহর ওয়ারসা-র সব থেকে উঁচু নির্মাণ কাঠামো। টয়েনবীর মতে-পোল্যাণ্ডের নাগরিকদের সামনে নিজেদের প্রভুত্বের স্থায়ী প্রদর্শনী করতেই রাশিয়ানরা সেটা করেছিল। এর নির্মাণের ইতিহাস প্রতি পদে অন্তত সেই সাক্ষ্যই বহন করে। আসলে প্রতিনিয়ত চোখে আঙুল দিয়ে পোল্যাণ্ডের মানুষদেবকে রাশিয়ানরা দেখিয়ে দিতে চেয়েছিল যে তারাই পোল্যাণ্ডের প্রভু।**

১৯১৮-তে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে রাশিয়ান আগ্রাসনের অবসান হলে আবারও নিজের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয় পোল্যাণ্ড। আর **স্বাধীন পোল্যাণ্ডের সরকার প্রথমেই রাশিয়ানদের তৈরী সেই গীর্জা ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। শুধু তাই নয়—গীর্জা ভাঙার কাজ যতদিন ধরে চলেছিল ততদিন তার ধারাবিবরণী শোনানো হতো পোল্যাণ্ডের সরকারি রেডিওতে।** প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষের কিছু পরে ১৯২০-এর দশকে টয়েনবী সেখানে পৌঁছনোর কিছুদিন আগেই সম্পূর্ণ সরকারি উদ্যোগে সেই রাশিয়ান গীর্জা সম্পূর্ণ ভেঙে ফেলে পোল্যাণ্ড। সেটাও সরকারি উদ্যোগে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য বিষয় এটাই যে রাশিয়ানদের মতনই পোল্যাণ্ডের মানুষরাও কিন্তু খ্রিস্ট ধর্মানুলম্বী। তবুও চোখের সামনে সটান দাঁড়িয়ে থাকা রাশিয়ান প্রভুত্বের চিহ্ন দুরমুশ করতে পোল্যাণ্ড এতটুকু দ্বিধা বোধ করেনি। অর্থাৎ সেসিময়ে ধর্মীয় ভাবাবেগকে ছাপিয়ে গিয়েছিল পোল্যাণ্ডের মানুষদের আত্মমর্যাদা আর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষার প্রশ্ন।

এর পরেই টয়েনবী বলেন পোল্যাণ্ডে তাঁর অতীত

অভিজ্ঞতার সাথে ভারতে যে অভিজ্ঞতা তিনি সঞ্চয় করেছেন সেই দু'য়ের মধ্যে অদ্ভুত মিল তিনি খুঁজে পেয়েছেন। স্পষ্ট শব্দে সেদিন **টয়েনবী বলেছিলেন—যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে পোল্যাণ্ডের রাজধানীর প্রাণকেন্দ্রে রাশিয়া তাদের নিজেদের সাবেকী ঐতিহ্যের গীর্জা বানিয়েছিল ঠিক সেই একই ইচ্ছাকৃত অসৎ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কাশী, মথুরা আর বারাণসীতে তিনটি মসজিদ নির্মাণ করিয়েছিলেন ভারতের মুঘল শাসক ঔরংজেব। ভারতের তথা সনাতন হিন্দুদের ধর্মীয় আস্থার পবিত্রের মধ্যে পবিত্রতম তিন কেন্দ্রে এই তিনটে মসজিদ আসলে ভারতে ইসলামী শাসনের প্রভুত্বের প্রতীক চিহ্ন।** তিনি এ কথা বলতে বাধ্য হচ্ছেন যে প্ররোচনা দেওয়ার মতন পরিস্থিতি বা দৃশ্যপট সৃষ্টি করার এক অদ্ভুত উদ্ভাবনী ক্ষমতা আর অনন্য পারদর্শীতা ঔরংজেবের ছিল। এক্ষেত্রে ঔরংজেব আর স্পেনের শাসন দ্বিতীয় ফিলিপকে জুড়িদার বলা যেতেই পারে। এরা আদতে খ্রিস্ট বা ইসলামের মতন আব্রাহামিক ধর্মের ধার্মিক উন্মাদনার নিষ্ঠুর অবতার স্বরূপ। ঔরংজেব আসলে অত্যন্ত খারাপ ধরণের ধর্মোন্মাদ আর আদতে দিগভ্রষ্ট এক মানুষ। যে তার ব্যর্থতার বিশাল বিশাল সৌধ নির্মাণ করতেই নিজের গোটা জীবন ব্যয় করেছে। স্বাধীনতা পাওয়ার পরেই পোল্যাণ্ডের মানুষ নিজেদের আত্মমর্যাদা আর সংস্কৃতির প্রতি যে সুবিচার করেছে ভারতীয়রা তা করতে পারেনি।

পরিশেষে ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের বক্তৃতার অংশবিশেষ উল্লেখ না করে এই নিবন্ধ শেষ করলে অনুচিত হবে। ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পরে ১৯৫০-এ সোমনাথ মন্দির পুনর্নির্মাণ সম্পূর্ণ হলে তার উদ্বোধন করেছিলেন ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ। যে সোমনাথ মন্দির একাদশ শতাব্দীতে আরেক ইসলামিক আক্রমণকারী, মাহমুদ গজনীর আগ্রাসনে লুণ্ঠিত আর ধ্বংস হয়েছে বারে বারে। সেই সোমনাথ মন্দির পুনর্নির্মাণের পরে তার উদ্বোধন করে ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ বলেছিলেন—''ধ্বংসস্তূপের ছাই থেকে আবারো উঠে দাঁড়িয়ে এই ভব্য সোমনাথ মন্দির উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করছে—যার প্রতি কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে অটুট বিশ্বাস আর নিঃসীম শ্রদ্ধা আছে তাকে চিরতরে মুছে দেওয়ার ক্ষমতা পৃথিবীর কোনও শক্তির নেই।'' আজ আমাদের এই প্রচেষ্টা ইতিহাসের ভুল শুধরে দেওয়ার জন্যে নয়। যে দৃঢ় বিশ্বাস, শ্রদ্ধা আর মূল্যবোধ ধারণ করে আমাদের সনাতন ধর্ম স্মরণাতীত কাল থেকে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে অগ্রসর হয়ে চলেছে তার সাথে একাত্ম হওয়ার কথা নতুন করে আবারও উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য।

করসেবকপুরম্, জানকীঘাট, পরিক্রমা মার্গ, অযোধ্যা

।। সামাজিক সমরসতা বিভাগ।।

দিনাঙ্ক-০৫/১২/২০২১

।। আলোক কুমার, কেন্দ্রীয় কার্যকারী সভাপতি-র প্রেসবার্তা ।।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সামাজিক সমরসতা বিভাগের দুই দিনের সর্বভারতীয় বৈঠক রবিবার ৫ ডিসেম্বর,২০২১ অযোধ্যায় সম্পন্ন হল। বৈঠকে কিছু তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সমরসতাযুক্ত ভারত নির্মাণের জন্য আগামী সময়ে সমগ্র দেশে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বিভিন্ন জন জাগরণ কার্যক্রমের মাধ্যমে-

'অস্পৃশ্যতা' এবং মানসিক সামাজিক বিকৃতিকে কেবল আইনের মাধ্যমে অথবা রাজনৈতিক অধিকার দিয়ে দূর করা সম্ভব নয়। এজন্য সমুচ্চ হিন্দু সমাজকে হিন্দু ধর্মের মানবতাবাদী, সাম্যবাদী এবং একাত্মবাদী সমরস জীবন দর্শনকে নিজেদের ব্যবহারিক জীবনে অনুশীলন করতে হবে। নিজেকে দিয়েই এটি শুরু করতে হবে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সামাজিক সমরসতা বিভাগ সারা দেশে বহু বছর ধরে বিভিন্ন কার্যক্রম, জনজাগরণ ও আন্দোলনের মাধ্যমে এই কাজ করে চলেছে। হিন্দু সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির মানসিকতা নিষ্কলুষ করে তোলবার জন্য আগামীদিনে দেশজুড়ে সেবা ও জনজাগরণমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রয়াস করা হবে।

সরকারি প্রকল্পগুলির সুবিধে যাতে অনুসূচিত জাতিগুলি পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছোয় সেজন্য শিক্ষা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য ও উপার্জন বৃদ্ধির চেষ্টা করা হবে।

১) ১৪ জানুয়ারি মকর সংক্রান্তির দিন সারা দেশে সামাজিক সমরসতা দিবস রূপে পালন করা হবে। এই কার্যক্রমগুলি প্রখন্ড স্তর পর্যন্ত সকলকে নিয়ে মিলে মিশে করতে হবে।

২) ১৬ ফেব্রুয়ারি সারা দেশে সন্ত রবিদাস জয়ন্তী পালন করা হবে।

বাবা সাহেব আম্বেদকর, মহর্ষি বাল্মিকী, সন্ত কবীর ও অন্য মহাপুরুষদের জয়ন্তী পালন করা হবে।

।। বিবিধ কার্য ও কার্যক্রম।।

১) দেশের সমস্ত গ্রাম, প্রখন্ড, তহসীল ও জেলা কেন্দ্রে হিন্দু সমাজের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ব্যক্তিমাত্রেই যেন মন্দিরগুলিতে দেবদর্শন করতে পারেন তা সুনিশ্চিত করতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কার্যকর্তারা উপযুক্ত সমরস বাতাবরণ তৈরির প্রয়াস করবেন।

২) দেশের কোথাও যেন পানীয় জলের সমস্যা না থাকে, গ্রামের সকলে যেন একই স্থান থেকে পানীয় জল সংগ্রহ করতে পারে এমন সমরসতাযুক্ত গ্রাম নির্মাণ করা হবে।

৩) মৃত্যুর পরে যাতে হিন্দুদের সকল জাতি-সম্প্রদায়ের মানুষকে একই শ্মশানভূমিতে দাহ করা যায় ,সেজন্য বিশ্ব হিন্দু পরিষদ জনজাগরণ চালাবে।

৪) আমরা যেই জাতি, পন্থ, মত বা সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হই না কেন, আমরা সকলে পরস্পরের ভ্রাতৃপ্রতিম এই ভাব নির্মাণ করবার জন্য কার্যক্রম আয়োজন করা হবে।

৫) জেলা ও তহসীলের গ্রামগুলিতে বিভিন্ন জাতি-সম্প্রদায়ের সমস্ত বন্ধু একসঙ্গে বসে ধার্মিক অনুষ্ঠান 'সমরসতা মন্ত্র'-তে অংশগ্রহণ করানো হবে ও সামূহিক ভোজনের ব্যবস্থা করা হবে।

৬) শহরের সেবা বস্তিগুলিতে সেবাকার্য, সেলাই কেন্দ্র, ফ্রি কোচিং ক্লাস, বাল সংস্কার কেন্দ্র, সৌন্দর্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ইত্যাদি চালানো হবে।

৭) আমাদের মহাপুরুষদের জয়ন্তী বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মাধ্যমে উদ্যাপন করা হবে। ড বাবা সাহেব আম্বেদকর জয়ন্তী, সন্ত শিরোমণি রবিদাসজি মহারাজ জয়ন্তী, মহর্ষি ভগবান বাল্মিকী জয়ন্তী, শ্রী কবীর দাস জয়ন্তী, শ্রী মহাত্মা গান্ধী জয়ন্তী, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ জয়ন্তী ইত্যাদি উদ্যাপন করা হবে।

৮) তহসীলের গ্রামে পূজনীয় সন্ত মহাত্মাদের নিয়ে সমরসতা পদযাত্রা আয়োজন করা হবে ও এভাবে সামাজিক একতা ও সমরসতা গড়ে

উঠবে।

৯) সমরসতা গোষ্ঠী সম্মেলন, যুবা সম্মেলন, মহিলা সম্মেলন, বিভিন্ন জাতি-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সদ্ভাবনা বৈঠক ইত্যাদি আয়োজন করে বৈচারিক জাগরণের আয়োজন গ্রামে গ্রামে হবে।

১০) বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দ্বারা তহসীল, জেলা কেন্দ্রে গণবিবাহের আয়োজন করা হবে। দরিদ্র পরিবারের কন্যাদের বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

১১) অনুসূচিত জাতির সমাজবন্ধুরা যাতে হিন্দু সমাজে ন্যায় ও সমান ব্যবহার পান তেমন সমরসতাপূর্ণ বাতাবরণ তৈরি করবার জন্য বিশ্ব হিন্দু পরিষদ চেষ্টা করবে।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধু নমস্কার।

আপনার জনপ্রিয় সংবাদপত্র এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় অনুগ্রহ করে এই বার্তা প্রচার করবেন। রাষ্ট্রীয় হিন্দু একতা কার্যে সহযোগিতা করুন, আপনাদের কাছে এই প্রত্যাশা রাখি।

আপনাদের

(আলোক কুমার)
কেন্দ্রীয় কার্যাধ্যক্ষ

পরিষদ বার্তা

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে বীরভূমে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

গত ২৭ ও ২৮ নভেম্বর বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে বীরভূম জেলার দুই স্থানে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির আয়োজন করা হয়। উভয় স্থানেই ইসিজি,রক্ত পরীক্ষা, রক্তচাপ, বিনামূল্যে ওষুধ, প্রেসক্রিপশন ও চোখ পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল।

খরমাডাঙার স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরে ৩৫০ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয়। এখানে ৭০ জনকে বিনামূল্যে চশমা দেওয়া হয়।

তারাপুরের শিবিরে ২০০ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয়। এখানে ৬০ জনকে বিনামূল্যে চশমা দেওয়া হয়।

উভয় স্থানেই ড অর্চনা মজুমদারের নেতৃত্বে ১৫ জন চিকিৎসক ও ৫ জন স্বাস্থ্যকর্মী শিবির পরিচালনা করেন।

উভয় শিবিরেই উপস্থিত ছিলেন ক্ষেত্রীয় সম্পাদক অমিয় সরকার, প্রান্ত সহ সভাপতি পিরোজ এডুলজি, কলকাতা হাইকোর্টের অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল ওয়াই দস্তুর, বিশিষ্ট আইনজীবী মণীন্দ্র সুন্দর দাস, প্রান্ত সহ সম্পাদক অরিন মন্ডল, বীরভূম বিভাগ সংগঠক দেবাশিস চট্টোপাধ্যায়, জেলা সভাপতি প্রভাত মন্ডলসহ জেলার বিশিষ্ট কার্যকর্তারা।

বহরমপুরে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

গত ৫ ডিসেম্বর বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে বহরমপুরের সৈদাবাদ সত্য নারায়ণ মন্দিরে সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত এক নিঃশুল্ক স্বাস্থ্য শিবির আয়োজন করা হয়। এই শিবিরে ২ জন বিশিষ্ট চিকিৎসক দ্বারা মোট ৬১ জন রোগীর রোগ নির্ণয় করে ওষুধ দেওয়া হয়। কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন জেলা ও নগর স্তরের বিশিষ্ট কার্যকর্তারা।

জুতো দিয়ে মন্ডপ সাজানোর প্রেক্ষিতে হাইকোর্টের কাছে গাইডলাইন প্রার্থনা করল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ

এ বছর দমদম ভারতচক্রের পুজোয় জুতো দিয়ে মন্ডপসজ্জা করায় তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। হিন্দু দেবালয়ে জুতো পরে যাওয়ার নিয়ম নেই। মন্দিরগাত্রে জুতোর নক্সা ইত্যাদি কোথাও দেখা যায় না। দেবালয় থেকে জুতোকে দূরেই রাখা হয়। এজন্য জুতো দিয়ে মন্ডপসজ্জা করায় হিন্দুদের ধর্মীয় ভাবাবেগে যথেষ্ট আঘাত লেগেছিল এই ঘটনায়। দমদমের ঐ পুজোর থিম ছিল 'কৃষক আন্দোলন'। কিন্তু মন্ডপসজ্জায় কৃষির কোনও উপকরণ বা অনুষঙ্গ চোখে পড়ে নি। মন্ডপজুড়ে ছিল শুধুই জুতো। কোনও কোনও বিশিষ্টজন আবার এই মন্ডপসজ্জাকে অতি উচ্চমানের শিল্প বলে বসেন। জুতো দিয়ে মন্ডপ তৈরির প্রশ্নে সমাজ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। এতে রাজনীতির আঁচও এসে লাগে যেহেতু থিমটি ছিল রাজনৈতিক ইস্যু। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পূর্ব ক্ষেত্রের পক্ষ থেকে গত ২ ডিসেম্বর এ বিষয়ে এবার আদালতে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হল ও একটি নির্দেশিকা বা গাইডলাইন চাওয়া হল। সেসঙ্গে যারা জেনেশুনে হিন্দুদের ভাবাবেগে আঘাত দিয়েছে তাদের শাস্তিরও দাবি করা হল। কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রী প্রকাশ শ্রীবাস্তবের ডিভিশন বেঞ্চ এই প্রসঙ্গে রাজ্য সরকারকে ২ ফেব্রুয়ারির মধ্যে হলফনামা দিতে বলেছে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পক্ষ থেকে হাইকোর্টকে জানানো হয়েছে, জুতো দিয়ে মন্ডপ সাজানোর খবর পেতেই ক্লাব কর্তৃপক্ষকে এর পরিবর্তন করতে বলা হয়েছিল। কিন্তু ক্লাব কর্তৃপক্ষ তাঁদের অবস্থানের কোনও পরিবর্তন ঘটান নি। অতএব এমন ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় সেজন্য আদালতের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া কোনও পথ খোলা ছিল না। (দৈনিক বর্তমান ৩/১২/২০২১)

শোক বার্তা

অরুণদা আর আমাদের মধ্যে নেই

দীর্ঘদিন রোগভোগের পরে গত ৯ ডিসেম্বর রাত ১টা বেজে ১৫ মিনিটে কলকাতার একটি ব্যক্তিগত নার্সিং হোমে পরলোকগত হলেন আমাদের সকলের প্রিয় অরুণদা (অরুণ ভট্টাচার্য)। অরুণদা ছিলেন বিশ্ব হিন্দু বার্তার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণপুরুষ। এছাড়া বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দক্ষিণ বঙ্গ প্রান্ত সহ সভাপতিসহ বিভিন্ন সাংগঠনিক দায়িত্ব সামলেছেন। সংস্কার ভারতীতে দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সহ সভাপতি ও অন্যান্য দায়িত্ব পালন করেছিলেন। বেশ কয়েক বছর যাবৎ তিনি দুরারোগ্য স্নায়ুরোগে ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর।

তিনি স্ত্রী, কন্যা, জামাতা ও একমাত্র নাতনীকে রেখে গেছেন। ওনার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পক্ষ থেকে জানাই গভীর সমবেদনা। ওনার বিদেহী আত্মা শান্তিলাভ করুক।

রাজ্য বার্তা

উত্তর ২৪ পরগণার দুই জায়গা থেকে নথি জাল করার অভিযোগে দুই রোহিঙ্গাকে গ্রেপ্তার করল উত্তর প্রদেশ পুলিশ

গত ২১ নভেম্বর উত্তর ২৪ পরগণার দুই জায়গা থেকে জামিল ও নুর আলম নামে দুই রোহিঙ্গাকে গ্রেপ্তার করে উত্তর প্রদেশ পুলিশ। ধৃতদের ট্রানজিট রিমান্ডে লখনউ নিয়ে যাওয়া হয়েছে। উত্তর প্রদেশ এটিএস সূত্রে জানানো হয়েছে, বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গাদের ভারতে লুকিয়ে থাকার ব্যবস্থা করে দিত ধৃত দুই ব্যক্তি। হিন্দু নামে জাল পরিচয়পত্র বানিয়ে বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গাদের দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পাঠিয়ে দিত তারা। পরে তাদের আসল পরিচয় জানিয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে ব্ল্যাকমেল করত।

অক্টোবর মাসে ভুয়ো পরিচয়পত্রসহ ৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছিল উত্তর প্রদেশ yATS . তাদের সঙ্গে মানব পাচারকারী চক্রের যোগ পান তদন্তকারীরা। খবর আসে , ৩ বাংলাদেশিকে নিয়ে কলকাতা থেকে দিল্লী যাচ্ছে আর এক পাচারকারী। পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় স্টেশনে তাদের আটক করেন তদন্তকারীরা। তাদের জেরা করে উত্তর ২৪ পরগণার লুকিয়ে থাকা ২ রোহিঙ্গার খোঁজ মেলে। ধৃত জামিল ও নুর আমিনের কাছ থেকে জাল আধার, ভোটার কার্ড ও মায়ানমারের নথি পাওয়া গেছে।

রাষ্ট্র বার্তা

গত পাঁচ বছরে মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকীকরণে কেন্দ্র সরকার ব্যয় করেছে ৫২০.৫৪ কোটি টাকা

লোকসভায় মাদ্রাসার আধুনিকীকরণ বিষয়ে AIMIM সাংসদ আসাদ উদ দ্বীন ওয়েসির এক প্রশ্নের উত্তরে সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী মুখতার আব্বাস নাকভি বলেন, SPEMM স্কিমের অধীনে মাদ্রাসাগুলির আধুনিকীকরণে গত পাঁচ বছরে ৫২০.৫৪ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এই টাকা থেকে মাদ্রাসা শিক্ষকদের জন্য সাম্মানিকও দেওয়া হয়েছে। এই বিষয়ক সরকারের দু'টি স্কিম হল, SPEMM (Scheme for Providing Quality Education in Madrasas) এবং IDMI (Infrastructure Development in Minority Institutions) ।প্রথম স্কিমটির ভূমিকা হল পরম্পরাগত মাদ্রাসাগুলিতে যেখানে পূর্বে কেবল অক্ষরজ্ঞান এবং কুরআন শিক্ষা দেওয়া হতো সেখানে বিজ্ঞান,গণিত, সমাজ বিজ্ঞান, হিন্দী ও ইংলিশ পড়ানোর বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া এবং এই মাদ্রাসাগুলিকে 'সমগ্র শিক্ষা'-র আওতায় নিয়ে আসা। এজন্য কতক গুলি রাজ্যের সরকারকে অর্থ বরাদ্দ করা হয়। এইসব রাজ্যগুলি হল বিহার,ছত্রিশগড়, ঝাড়খন্ড,মধ্য প্রদেশ, রাজস্থান, ত্রিপুরা, উত্তরাখন্ড ও উত্তর প্রদেশ। (সৌজন্যে ঃ NEO POLITICO)

দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে ধর্মান্তরিত করা হয়েছিল ঃ অসমে হিন্দুধর্মে ফিরে এল একটি পরিবার

অসমের উধারবন্দের একটি চা-শ্রমিক পরিবারের দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে তাদের ধর্মান্তরিত করেছিল খ্রিষ্টান মিশনারিরা। এখন ভুল বুঝতে পেরে আবার হিন্দুধর্মে ফিরে এল পরিবারটি। মূলতঃ কয়েকজন হিন্দুত্ববাদী যুবকের উদ্যোগে গত ২ ডিসেম্বর এক শুদ্ধিযজ্ঞের মাধ্যমে তাঁরা হিন্দুধর্মে ফিরে আসেন। (সৌজন্যে ঃ Hindu Voice)

মুসলিম যুবকের প্রেমের প্রস্তাবে রাজি না হয়ে বাড়ির পছন্দের পাত্রকে বিয়ে করায় যুবতীকে গুলি

হরিয়ানার রোহতক জেলায় তনিষ্কা শর্মা নামে এক যুবতীর প্রতি আকৃষ্ট ছিল পাশের পাড়ার মহম্মদ সাহিল। কিন্তু তার প্রেমের প্রস্তাবে সাড়া না দিয়ে বাড়ির পছন্দের পাত্রকে বিয়ে করবার সিদ্ধান্ত নেয় তনিষ্কা। সেইমতো গত ১ ডিসেম্বর তাঁর বিয়েও সম্পন্ন হয়ে যায়। বিয়ের অনুষ্ঠান মিটতে স্বামী,ভাই ও দেবরের সঙ্গে শ্বশুরবাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার পথে যমদূতের মতো দুই সহযোগীকে নিয়ে উপস্থিত হয় মহম্মদ সাহিল। তারা বরের গাড়ি আটকায় ও বন্দুক দেখিয়ে তনিষ্কাকে গাড়ি থেকে বের করে। এরপর মহম্মদ সাহিল তনিষ্কার দেহে এলোপাথাড়ি গুলি চালায় ও তারপর বাইকে চেপে পালিয়ে যায়।

ঘটনার পর বাকিরা গাড়িতে চাপিয়ে তনিষ্কাকে পিজিআই হাসপাতালে নিয়ে যান এবং সেখানে তাঁর অবস্থা দেখে তাঁকে ট্রমা

সেন্টারে নিয়ে যান চিকিৎসকেরা। চিকিৎসকেরা জানান তনিষ্কার মুখ,পেট ও গলায় মোট ৬টি গুলি লেগেছে। তাঁর বাঁচার আশা ক্ষীণ। এই ঘটনার পর থেকে পলাতক মহম্মদ সাহিল। পুলিশ তার দুই সঙ্গীকে গ্রেপ্তার করেছে। তবে ঐ দুই সঙ্গী নাবালক হওয়ায় তাদেরকে জুভেনাইল সংশোধনাগারে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ সাহিলকে খুঁজছে। (সৌজন্যে ঃ Hindu Voice)

মথুরায় শাহী ইদগাহে শ্রীকৃষ্ণের জলাভিষেকের ঘোষণা ঃ নামানো হলো প্যারা মিলিটারি ফোর্স

গত ৬ ডিসেম্বর মথুরার শাহী ইদগাহ মসজিদে শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ও জলাভিষেকের ডাক দেয় অখিল ভারত হিন্দু মহাসভা, শ্রীকৃষ্ণ জন্মভূমি নির্মাণ ন্যাস ও নারায়ণী সেনা। এই ঘোষণার পরে কোনওপ্রকার অপ্রীতিকর অবস্থা যাতে সৃষ্টি না হয় সেজন্য ব্যাপক প্রস্তুতি নেওয়া হয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে। শাহী ইদগাহ মসজিদ ও শ্রীকৃষ্ণ জন্মভুমির দিকে যাওয়ার প্রতিটি রাস্তায় বসানো হয় পুলিশ পিকেট। প্রতিটি রাস্তায় বসানো হয় সিসিটিভি। রাস্তা দিয়ে চলাচলকারী লোকেদের ধরে চেকিং করা হয়। ঐ এলাকায় কোনওপ্রকার জমায়েত আটকাতে ব্যবহার করা হয় ড্রোন, জমায়েত ছত্রভঙ্গ করতে মজুদ রাখা হয় বাহিনী , কুইক রেসপন্স টিম, প্যারা মিলিটারি ও র‍্যাফ। মথুরার সমস্ত থানাকে নির্দেশ দেওয়া হয় যাতে কেউ সোশাল মিডিয়ায় শ্রীকৃষ্ণ জন্মভূমি বা শাহী ইদগাহ মসজিদ নিয়ে আপত্তিকর পোস্ট করলে তার বিরুদ্ধে এফ আই আর দায়ের করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

হিন্দুদের দাবি শাহী ইদগাহ মসজিদ তৈরি করা হয়েছে শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি মন্দির ভেঙে। এই নিয়ে মথুরা কোর্টে মামলাও চলছে। (সৌজন্যে ঃ Hindu Voice)

লাদাখের কার্গিলে বৌদ্ধ তরুণীকে অপহরণ করে ধর্মান্তরণ

এক বৌদ্ধ তরুণীকে অপহরণ করে ধর্মান্তরণ ও বিবাহ করবার অভিযোগ উঠল জনৈক মুসলমান যুবকের বিরুদ্ধে। কার্গিলের অন্তর্গত পদম জংস্কর এলাকার বাসিন্দা আব্দুল কাদির ওয়ানি (৩১) ঐ এলাকারই বৌদ্ধ তরুণী সোনম এংমোকে নিকাহ্ করেন। নিকাহ্ করবার পূর্বে সোনমকে ধর্মান্তরিত করে মুসলমান করা হয় ও তাঁর নতুন নাম হয় সুমাইয়া কাউসার । এইসব ক্ষেত্রে ধর্মান্তরিত যুবতীরা অনেক ক্ষেত্রে ভয়ে কিংবা নিরুপায় হয়ে স্বেচ্ছায় আত্মীয় পরিজনদের ছেড়ে ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমানকে বিয়ে করেছে বলে স্বীকারোক্তি দিয়ে থাকে। এক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। সোনম স্বেচ্ছায় এই কান্ড ঘটিয়েছে বলে মানতে নারাজ তাঁর আত্মীয় পরিজনেরা। স্থানীয় বৌদ্ধরা এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ ও তাঁরা বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। এই নিয়ে যাতে কোনওপ্রকার সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি না হয় সেকথা মাথায় রেখে কার্গিলে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। (সৌজন্যে ঃ Hindu Voice)

অত্যধিক কম জন্মহার এবং ধর্মান্তরণের কারণে দেশে হিন্দুদের অনুপাত কমছে ঃ স্বামী রামভদ্রাচার্য

চিত্রকূটের শ্রী তুলসী পীঠের অধ্যক্ষ স্বামী রামভদ্রাচার্য জানিয়েছেন, অত্যধিক কম জন্মহার এবং ধর্মান্তরণের কারণে দেশে হিন্দুদের অনুপাত কমছে। টিভি৯ ভারতবর্ষকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, স্বাধীনতার পরে হিন্দুদেরকে তাঁদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। হিন্দু তরুণীদেরকে প্রেমের ফাঁদে ফেলে ধর্মান্তরিত করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। তিনি সমগ্র দেশে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রচলিত করবার পক্ষপাতী। তিনি বলেন, ১০০ কোটি হিন্দু যদি আওয়াজ তোলেন, তবে ২০২৪ সালের আগেই দেশে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রচলিত হবে। (সৌজন্যে ঃ Hindu Voice)

বিহার বিধানসভায় 'বন্দেমাতরম্' গাওয়া নিয়ে স্পীকারের সঙ্গে বচসা 'মিম' বিধায়কদের

বিহার বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম ও শেষ দিন জাতীয় সঙ্গীত 'বন্দেমাতরম্' গাওয়ার নিয়ম চালু করেন স্পীকার বিজয় কুমার সিনহা। 'বন্দেমাতরম্' গাওয়ার সময় অন্য সব দলের বিধায়কেরা উঠে দাঁড়ালেও আসাদ উদ্ দ্বীন ওয়েসির 'মিম' দলের বিধায়করা বসে থাকেন। ঐ দলের বিধায়ক আখতারুল ইমান উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, ''জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া বাধ্যতামূলক নয়। সংবিধানের কোথাও এই গান গাওয়ার কথা বলা নেই।'' এই নিয়ে স্পীকারের সঙ্গে বচসা বেঁধে যায় 'মিম' বিধায়কদের। পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় আখতার উল জানান, ''স্পীকার জোর করে অন্য সংস্কৃতি চাপিয়ে দিচ্ছেন। আমি দেশপ্রেমী, কিন্তু 'বন্দেমাতরম্' কখনও গাইবো না।''

'মিম' বিধায়কদের এমন আচরণের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে বিজেপি। বিজেপি বিধায়ক ভূষণ ঠাকুর বলেন, ''যে সব ব্যক্তি ভারতের খেয়ে পরে ভারতের জাতীয় সঙ্গীত গাইতে অস্বীকার করে, তারা কখনওই দেশপ্রেমিক নয়। তারা আসলে জেহাদি

মানসিকতার।" ঐ বিধায়কদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান তিনি। (সৌজন্যে ঃ Hindu Voice)

মসজিদের বাইরে লাউডস্পীকার ব্যবহারে আপত্তি বিজেপি বিধায়িকা অগ্নিমিত্রা পালের

সৌদি আরবে মসজিদের বাইরে লাউড স্পীকার ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা থাকলেও পশ্চিমবঙ্গে তা নেই। পশ্চিমবঙ্গেও অনুরূপ নিয়ম কার্যকর করা যায় কি না তা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জানতে চেয়ে ট্যুইট করলেন বিজেপি সাংসদ অগ্নিমিত্রা পাল। এই ট্যুইটে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, দিলীপ ঘোষ, শুভেন্দু অধিকারী ও সুকান্ত মজুমদারকে মেনশন করেছেন তিনি। (সৌজন্যে ঃ ডেইলি হান্ট)

বিহারে প্রতিটি মন্দিরকে দিতে হবে ৪ শতাংশ করে কর

বিহারে এবার থেকে প্রতিটি মন্দিরকে সরকারি খাতায় নাম লেখাতে হবে এবং উপার্জনের ৪ শতাংশ হারে কর দিতে হবে বলে ঘোষণা করেছে বিহার স্টেট বোর্ড অফ রিলিজিয়াস ট্রাস্ট (BSBRT)। এর থেকে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ছোট ছোট মন্দিরও বাদ যাবে না যদি সেগুলি সার্বজনীন হয়। BSBRT জানিয়েছে এটি কর নয়, এটি হল সেবামূল্য। আগেও এই রাশি মন্দিরগুলি থেকে সংগ্রহ করা হতো, কিন্তু তখন ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ছোট মন্দিরগুলি এর আওতার বাইরে ছিল। তখন করের হার ছিল ৫ শতাংশ। এখন সেটি কমিয়ে ৪ শতাংশ করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের এই ব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট হিন্দুরা। তাঁদের বক্তব্য হল, ছোট মন্দিরগুলি প্রায়শ মানুষের দানের টাকাতেই চলে। লোকের থেকে চেয়ে চিন্তে একটা বাল্ব বা ঝাঁটা কিনতে হয়। ঠাকুরমশাইরা প্রায়ই বিনা সাম্মানিকে পুজো করে দিয়ে যান। এই অবস্থায় কেবল হিন্দু দেবালয় থেকে কর আদায়ের মানে কী? মুসলমান বা খ্রিস্টান উপাসনালয়গুলিকে তো কোনওপ্রকার কর দিতে হয় না। হিন্দুরা মন্দির প্রশাসনের বিষয়ে আর কোনও সরকারি হস্তক্ষেপ পছন্দ করছে না।

কেরলের মাম্বারামে স্ত্রীর সামনেই কুপিয়ে খুন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবককে

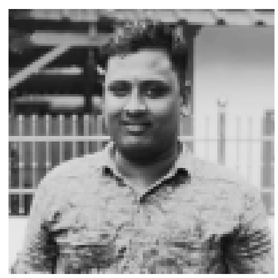

গত ১৫ নভেম্বর সকালে স্ত্রীর সামনেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক এস সঞ্জিতকে (২৭) ধারালো অস্ত্রের কোপে খুন করল কিছু দুষ্কৃতী। ঐদিন সকাল ৯ টা নাগাদ মাম্বারাম এলাকায় তিনি স্ত্রীর সঙ্গে মোটর বাইকে চড়ে কাজে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ বাইকে চড়ে দুষ্কৃতিরা এসে তাঁকে ধাক্কা মারে। সঞ্জিত পড়ে গেলে তারা এসে স্ত্রীর সামনেই সঞ্জিতকে ৫০ টি কোপ মারে। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

বিজেপির রাজ্য সভাপতি কে সুন্দরন বলেন, এটি একটি 'পরিকল্পিত হত্যাকান্ড'। এই ধরণের হত্যাকান্ড রোধ করতে না পারার জন্য তিনি পুলিশ ও পিনারাই বিজয়নের নেতৃত্বাধীন সরকারকে দায়ী করেন। বিজেপির জেলা সভাপতি কে এম হরিদাস এই ঘটনায় 'পপুলার ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়া'-র রাজনৈতিক প্লাটফর্ম 'সোশাল ডেমোক্রাটিক পার্টি'-র জড়িত থাকার অভিযোগ করেন।

গত তিন বছরে পাকিস্তান সীমান্তের তুলনায় বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটেছে অন্তত ১৩ গুণ বেশি

গত তিন বছরে বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে সর্বাধিক অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটেছে। ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত দিয়ে যত অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটেছে, তার চেয়ে প্রায় ১৩ গুণ বেশি বেআইনি অনুপ্রবেশের ঘটনা বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে ঘটেছে বলে লোকসভায় দাবি করলো কেন্দ্র সরকার। লোক জনশক্তি পার্টির সাংসদ চিরাগ পাসোয়ান জানতে চেয়েছিলেন, গত তিন বছরে সীমান্ত দিয়ে কতগুলি অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটেছে। তার ভিত্তিতে ৭ ডিসেম্বর লোকসভায় একটি লিখিত উত্তরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক বলেন,''পাকিস্তান সীমান্ত দিয়ে ১২৮ টি অনুপ্রবেশের ঘটনা, বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে ১,৭৮৭ টি, নেপাল সীমান্ত দিয়ে ২৫ টি এবং মায়ানমার সীমান্ত দিয়ে ১৩৩ টি অনুপ্রবেশের ঘটনার খবর মিলেছে। তবে চীন ও ভুটান সীমান্ত দিয়ে সেই সংখ্যাটা শূন্য।" বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের পাঁচ রাজ্যের পশ্চিমবঙ্গ,অসম,মেঘালয়,মিজোরাম এবং ত্রিপুরা) সীমান্ত আছে। এই সীমান্ত ৪,০৯৫ কিলোমিটার দীর্ঘ। অমিত শাহের ডেপুটি জানান, আইনানুসারে সরকারি বিভিন্ন এজেন্সি এবং রাজ্য সরকারের সঙ্গে বিষয়টির উপরে নজর রেখেছে সীমান্তে প্রহরারত বিভিন্ন বাহিনী। সেইসঙ্গে অনুপ্রবেশে লাগাম টানতে আন্তর্জাতিক সীমান্তে বাড়তি বাহিনী মোতায়েন, সীমান্তে কাঁটাতার দেওয়া,আলো লাগানো,টহলদারির মতো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। আন্তর্জাতিক সীমান্ত

দিয়ে অনুপ্রবেশ কম করতে যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে বলে জানান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী।

হিন্দু ধর্মে ফিরে এলেন শিয়া ওয়াকফ বোর্ডের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ওয়াসিম রিজভি

গত ৬ ডিসেম্বর বিশেষ ধর্মীয় কৃত্যের মাধ্যমে হিন্দু ধর্মে ফিরে এলেন শিয়া ওয়াকফ বোর্ডের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ওয়াসিম রিজভি। গাজিয়াবাদের দাসনাদেবীর মন্দিরে মোহান্ত যতি নরসিংহানন্দ গিরির উপস্থিতিতে তিনি নিজের পূর্বপুরুষদের ধর্মে ফিরে আসেন। বর্তমানে তাঁর নাম হয়েছে জিতেন্দ্র নারায়ণ স্বামী। কোনও কোনও সংবাদমাধ্যমে যে প্রচার হয়েছে তাঁর নতুন নাম হরবীর নারায়ণ ত্যাগী, সেটি ঠিক নয় বলে জানিয়েছেন মোহান্ত নরসিংহানন্দ গিরি। হিন্দুধর্মে ফিরে এসে জিতেন্দ্র নারায়ণ বলেন, ''মোগলরা ভারতে হিন্দুদেরকে বিজিত জাতি হিসেবে প্রচার করবার ধারা তৈরি করে দিয়েছে। যে রাজনৈতিক দল হিন্দুদেরকে পরাজিত করে, মুসলমানেরা তাদেরকে ঢালাও ভোট দেয়। মুসলমানরা সর্বদা হিন্দুদেরকে পরাজিত দেখতে চায়।'' তিনি আরও বলেন, ''আমাকে ইসলাম থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। প্রতি শুক্রবার ওরা আমার মাথার জন্য নতুন দাম ধার্য করে। আজ আমি সনাতন ধর্ম গ্রহণ করছি।''

৬ ডিসেম্বর যে রিজভি সনাতন ধর্ম গ্রহণ করবেন,তা তিনি আগেই জানিয়েছিলেন। এজন্য তিনি গাজিয়াবাদের দাসনা মন্দিরের মোহান্তের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলছিলেন। কিছুদিন পূর্বে তিনি বলেন, তাঁকে যেন মৃত্যুর পরে কবর না দিয়ে দাহ করা হয়। তিনি মৃত্যুর পরে তাঁর মুখাগ্নি করবার জন্য দাসনা মন্দিরের মোহান্ত ও জুনা আখড়ার মহামন্ডলেশ্বরকে মনোনীত করেছেন।

মৌলবাদীরা ইতিপূর্বেই মুসলমানদের কবরস্থানে তাঁকে জায়গা দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছে। জিতেন্দ্র জানিয়েছেন তাঁর মৃত্যুর পর এ নিয়ে কোনও বিতর্ক তৈরি হোক তা তিনি চান না। তাঁর অন্ত্যেষ্টি হিন্দু পদ্ধতি অনুসারেই যাতে হয়, তেমন ইচ্ছা প্রকাশ করে তিনি প্রশাসনকে চিঠিও দিয়েছেন।

এর আগে বিভিন্ন বিষয়ে ওয়াসিম রিজভির অবস্থান উপমহাদেশের মুসলমানের মতিগতির সঙ্গে মেলে নি। অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণের তিনি ছিলেন সমর্থক। (সৌজন্যে - opindia.com)

শবরীমালা মন্দিরের নৈবেদ্যে হালাল প্রত্যয়িত গুড় ব্যবহার করবার প্রেক্ষিতে মামলা

শবরীমালা মন্দিরের নৈবেদ্যে হালাল প্রত্যয়িত গুড় ব্যবহার করবার জন্য ত্রিবাঙ্কুর দেবস্বাম বোর্ড ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে বিচারালয়ের দ্বারস্থ হল 'শবরীমালা অ্যাকশন কাউন্সিল' ও 'শবরীমালা আইয়াপ্পা সেবা সমাজম' । আদালতের কাছে যাচিকা দায়ের করে অবিলম্বে ঐ গুড় ব্যবহার করা প্রসাদ বিতরণ স্থগিত করা ও সেসঙ্গে বিষয়টি তদন্ত করে এর সঙ্গে যুক্ত আধিকারিকদের শাস্তি দেওয়ার দাবি করা হয়েছে। কেরল হাইকোর্ট যাচিকাটি গ্রহণ করেছেন ও এ বিষয়ে দেবস্বাম বোর্ডকে পরের দিন বেলা দু'টোর মধ্যে হলফনামা জমা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

ঔপনিবেশিক যুগে ব্রিটেন ভারত থেকে অন্তত ৯.২ ট্রিলিয়ন পাউন্ড বা ৪৪.৬ ট্রিলিয়ন ডলার সরিয়ে নিয়েছে

ব্রিটিশ শাসনকে আধুনিক ভারত গড়ার জন্য দৈব আশীর্বাদ ছিল বলে মনে করে থাকেন অধিকাংশ ভারতীয়। যদিও এর বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গিও রয়েছে। অর্থনীতিবিদ উষা পট্টনায়েকের মতে ভারতে ব্রিটিশ উপনিবেশের ২০০ (১৭৬৫ - ১৯৩৮) বছরে ব্রিটেন ভারত থেকে অন্তত ৯.২ ট্রিলিয়ন পাউন্ড বা ৪৪.৬ ট্রিলিয়ন ডলার সরিয়ে নিয়ে গেছে। একটি উপাত্ত থেকে এই টাকার পরিমাণটা বোঝা যাবে। তা হল, ব্রিটেনের ২০১৮ সালের জিডিপি হল ৩ ট্রিলিয়ন ডলার। ঔপনিবেশিক যুগে ভারত যা কিছু বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতো এবং জমা সোনার বিনিময়ে তার যা উপার্জন, তার সবটাই চলে যেত লন্ডনে। পুঁজি না থাকায় ভারতীয়রা আধুনিক যন্ত্রপাতি আমদানি করতে পারতেন না। এজন্য ভারতের আধুনিকীকরণ অত্যন্ত ব্যাহত হয়। ১৯০০ থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত ভারতীয়দের মাথাপিছু আয় এতটুকু বৃদ্ধি পায় নি। অথচ বিংশ শতকের প্রথম তিনটি দশকে বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারতের স্থান ছিল বিশ্বের মধ্যে দ্বিতীয়। সাধারণ মানুষ সে সময়ে অপুষ্টি ও রোগে ভুগছিল। মানুষের গড় আয়ু ছিল মাত্র ২২। বার্ষিক মাথাপিছু শস্যগ্রহণ ১৯০০ সালে ছিল ২০০ কেজি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভে তা কমে হয় ১৫৭ কেজি। বিশ্বযুদ্ধ যখন শেষ হল, তখন তা কমে হল মাত্র ১৩৭ কেজি। ১৯৪৬ নাগাদ ভারতের জনসাধারণের যা আর্থিক অবস্থা ছিল তার তুলনায় বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে অনুন্নত দেশটির মানুষের জীবনমানও ভালো।

ভারতে শাসনকার্য চালাতে পেরে ইংরেজরা শোষণের নেশায় মেতে উঠেছিল। কেবল ১৭৬৫ থেকে ১৭৭০ এর মধ্যে মাত্র পাঁচ

বছরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী রাজস্ব তিনগুণ বৃদ্ধি করেছিল। ১৭৭০ সালে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়। এই দুর্ভিক্ষে বাংলার ৩ কোটি মানুষের
মধ্যে ১ কোটি মারা যায়।

অল্প সংখ্যক শ্বেতাঙ্গ কীভাবে বিরাট সংখ্যক মানুষকে বঞ্চনা করতে পারে তার উ পায় উদ্ভাবন করতে গিয়েই শিল্প বিপ্লব ও পুঁজিবাদের জন্ম হয়। ইউরোপীয়রা এশিয়াকে উপনিবেশে পরিণত করতে না চাইলে এইসব কখনও সম্ভবপর হতো না।

ভগবান পরশুরামের তপোস্থলে গবেষণাকেন্দ্রের শিলান্যাস করলেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী চরণজিৎ সিং চান্নি

সংস্কৃত ভাষা শেখা ও মহাভারত নিয়ে পিএইচডি করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী চরণজিৎ সিং চান্নি। ভগবান পরশুরামের তপোস্থল শিলান্যাস করতে গিয়ে এই ইচ্ছা ব্যক্ত করেন তিনি। এই তপোস্থলে যে গবেষণাকেন্দ্র গড়ে উঠবে তা হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন বিষয়কে তুলে ধরবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন। তিনি আরও বলেন যে ব্রাহ্মণ সমাজের সঙ্গে তাঁর যোগ নিবিড়। জীবনকে অর্থপূর্ণ করে তোলবার জন্য আমাদের প্রতিদিন গীতার একটি করে শ্লোক শেখা উচিৎ। গীতার উপদেশের কোনও তুলনা হয় না। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ানো গবাদি পশুগুলির যত্নের কথা বলেন তিনি। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ সিং বাদলকে তিনি মহাভারতের ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে তুলনা করেন ও কটাক্ষ করে বলেন, পুত্র মোহ তাঁর দলকে (অকালি দল) ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছে।

জঙ্গী গোষ্ঠীর হয়ে প্রচারের অভিযোগে বাঁকুড়া থেকে গ্রেপ্তার ভিনরাজ্যের যুবক

জঙ্গী গোষ্ঠীর হয়ে প্রচারের অভিযোগে বাঁকুড়া থেকে গ্রেপ্তার করা হল ভিনরাজ্যের এক যুবককে। ধৃত মহম্দ রিয়াজ বাঁকুড়ার বড়জোড়ার আইটি হাবের কেয়ারটেকার হিসেবে কাজ করত। জানা গিয়েছে সে কেরালার এর্ণাকুলমের বাসিন্দা। একটি ডিভাইসের মাধ্যমে জঙ্গীগোষ্ঠীর হয়ে প্রচারকার্য চালাত সে। গোপন সূত্রে সেই খবর পেয়ে রিয়াজের উপরে নজরদারি চালাচ্ছিল পুলিশ। ১৭ নভেম্বর রাতে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃত মহম্মদ রিয়াজকে বাঁকুড়া জেলা আদালতে তোলা হয়। ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জেরা করবার ভাবনা রয়েছে তদন্তকারীদের। কী কারণে রিয়াজ কেরল থেকে বাংলায় এসেছিল, আদতে নাশকতার
ছক কষেছিল কি না, তা ধৃতকে জেরা করে জানা যাবে বলে মনে করছে পুলিশ।

সৌজন্যেঃ সংবাদপ্রতিদিন (sangbadpratidin-https://www.sangbadpratidin.in/bengal/suspectedterrorist-from-kerala-arrested-in-bankura/)

প্রকাশ ঃ ১৮ নভেম্বর ২০২১

বিশ্ব বার্তা

গত ৫০ বছরে বাংলাদেশ থেকে হারিয়ে গেছে ৭৫ লক্ষ হিন্দু

২০১১ সালে শেষবার জনগণনা হয়েছিল বাংলাদেশে। সেই জনগণনার পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট ১৯৭১-এ বাংলাদেশের জন্মের পরে ১৯৭৪-এ যখন প্রথমবার জনগণনা হয়েছিল তখনকার তুলনায় ২০১১-তে সে দেশের মোট জনসংখ্যা বেড়ে হয়েছে দ্বিগুণ। যদিও এই সময়কালে বাংলাদেশের হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে ৭৫ লক্ষ। বাংলাদেশের জন্মের পরে প্রথম জনগণনায় সে দেশের মোট জনসংখ্যার ১৩.৫% ছিল হিন্দু। ২০১১-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী যা ধারাবাহিক ভাবে কমে আজ থেকে বছর দশেক আগেই মাত্র ৮.৫% হয়েছে। ভৌগোলিক ভাবে ১৯৭১ থেকে আজ পর্যন্ত যা বাংলাদেশে ১৯৪৭-এর আগে তা ছিল অবিভক্ত বাংলার অংশ। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত পাকিস্তান। ১৯০১-এর জনগণনা অনুযায়ী এই ভৌগোলিক অঞ্চলে হিন্দু জনসংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার ৩৩%। তার পরে প্রতি দশ বছর অন্তর প্রত্যেকটা জনগণাতে হিন্দুদের জনসংখ্যা হ্রাস পেয়েছে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে। ১৯৪৭ এ দেশ ভাগের আগে শেষ জনগণনা হয়েছিল ১৯৪১-৪২-এ। সেই সময়ে এই ভৌগোলিক অঞ্চলে হিন্দু জনসংখ্যা কমে দাঁড়ায় ২৮%। এর দশ বছরের মধ্যে পাকিস্তান আমলে প্রথম জনগণনা হয় ১৯৫১-তে আর তখন দেখা যায় হিন্দু জনসংখ্যা আরো কমে গিয়ে মোট জনসংখ্যার ২২% হয়। ১৯৭১-এ বাংলাদেশ সৃষ্টির সময় যা আরো কমে গিয়ে

হয় ১৩.৫% আর আজ থেকে ১০ বছর আগে ২০১১ -তে তা আরও ভয়ঙ্কর ভাবে কমে গিয়ে দাঁড়ায় ৮.৫%। বিভিন্ন জনগণনার তথ্যের বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্ট ১৯৪৭-এর দেশভাগ, ১৯৫০-এ গোটা পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে হিন্দুদের উপর অত্যাচার, ১৯৬৫-এর ভারত-পাক যুদ্ধ আর ১৯৭১-এ বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধ সে দেশে হিন্দু জনসংখ্যা হ্রাসের অনুঘটকের কাজ করেছে। আর সাথে ধারাবাহিক ভাবে জুড়েছে ১৯৬৫-তে পাকিস্তান আমলে প্রথম লাগু হওয়া ''শত্রু সম্পত্তি আইন'' যা আজও সে দেশে বহাল রয়েছে।

সৌজন্যেঃ প্রথম আলো

পাকিস্তানের শিয়ালকোটে ধর্ম অবমাননার বাহানায় বহুজাতিকের হিন্দু জেনারেল ম্যানেজারকে প্রকাশ্যে হত্যা

গত ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তানের শিয়ালকোটে ধর্ম অবমাননার দায়ে এক শ্রীলঙ্কার নাগরিককে পুড়িয়ে মারলো তৌহিদী জনতা।

প্রিয়ান্থ কুমার (হিন্দু) নামে ঐ ব্যক্তি রাজকো ইন্ডাস্ট্রীজ নামে এক বহুজাতিকের জেনারেল ম্যানেজার (রপ্তানী) পদে কর্মরত ছিলেন। কোম্পানীটি খেলার সরঞ্জাম তৈরি করে। কোম্পানীর কারখানার কর্মীরাই তাঁকে পুড়িয়ে মারে। রটনা করা হয় যে আরবীতে নবী হোসেনের নাম লেখা একটি পোসটার নাকি তিনি ছিঁড়ে আবর্জনার বালতিতে ফেলে দিয়েছেন। এই বাহানায় কারখানার কিছু কর্মী তাঁকে নির্দয়ভাবে মারতে মারতে কারখানার বাইরে টেনে আনে। গোলমালের আওয়াজ পেয়ে সেখানে বহু লোক জমা হয়। কিন্তু ধর্মদ্রোহিতার বিষয়টি জুড়ে দেওয়া ছিল বলে সবাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখতে থাকে। প্রিয়ান্থা কুমারকে সকলে মিলে মেরে তাঁর পায়ের একটি হাড় ছাড়া সব হাড় ভেঙে দেওয়া হয়। এক পর্যায়ে তাঁর শরীরে আগুন ধরিয়ে দেয় সংখ্যাগুরু জনতা। সঙ্গে চলতে থাকে 'নারা এ তকবীর', 'লাব্বাইক এ রসুল আল্লাহ্' (মহানবীর সেবায় নিয়োজিত) এবং ' গুস্তাখ এ নবী এক হি সাজা সর তন সে জুদা সর তন সে জুদা' ইত্যাদি ধ্বনি।

পরবর্তীতে অভিযুক্তদের একজন জানায়, হাদিসে স্পষ্ট লেখা আছে যে ইসলামে সম্মানিত কোনও নবীর অসম্মান কেউ করলে তার মাথা কেটে নিতে হবে। কৃতকর্মের জন্য সে এতটুকুও অনুতপ্ত নয়। নবীদের যে অসম্মান করবে তার এমনই অবস্থা হবে। এর জন্য যদি প্রাণও যায় তাতেও দুঃখ নেই।

এই খুনের ঘটনায় শ্রীলঙ্কার দূতাবাস থেকেও পাক সরকারকে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে চাপ দেওয়া হয়েছে। পুলিশ বিষয়টির তদন্ত করছে এবং অপরাধীদের যথাযথ শাস্তির আশ্বাস দিয়েছে।

. লণ্ডনে আদালতে উঠল লর্ড মাউন্টব্যাটেনের গোপন চিঠিপত্র সার্বজনিক করার দাবি। ঘুরবে ইতিহাসের মোড়

ভারতের শেষ ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন ও তার স্ত্রী এডবিনা মাউন্টব্যাটেনের ডায়েরি তথা চিঠিপত্র সার্বজনিক করার দাবি বহুদিন ধরে চলে আসছে। যদিও ব্রিটিশ সরকার একাধিকবার এই সমস্ত তথ্য সার্বজনিক করতে অস্বীকার করেছে। লণ্ডনের এক আদালতে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের বিভিন্ন চিঠিপত্র সার্বজনীক করার দাবি উঠেছে। ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ অ্যাণ্ড্রু লনি আড়াই কোটি টাকা খরচ করে আদালতে এই গুরুত্বপূর্ণ মামলা লড়ছেন। ২০১১ সালে সাইথহ্যাম্পটন ইউনিভার্সিটি মাউন্টব্যাটেনের পরিবারের কাছ থেকে সাড়ে চার মিলিয়ন পাউণ্ড দিয়ে বেশকিছু নথিপত্র কিনেছিল। তবে পরবর্তীকালে ব্রিটিশ কেবিনেটের আদেশে বেশকিছু নথিপত্র সিল করে দিতে বাধ্য হয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ বলেছেন লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সমস্ত চিঠিপত্র সামনে এলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে আসবে। যার মাধ্যমে জানা যাবে ভারতের স্বাধীনতা নিয়ে মাউন্টব্যাটেন কতটা নিরপেক্ষ ছিলেন এবং জওহরলাল নেহেরুর সাথে মাউন্টব্যাটেনের আর তার পরিবারের কী ধরনের সম্পর্ক ছিল। এর পাশাপাশি রাজপরিবারের বেশকিছু পর্দা ফাঁস হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করেন এই বিখ্যাত ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ।

সৌজন্যেঃ ইণ্ডিয়া রাগ (https://indiarag.in/lettee-of-jawaharlal-nehru-and-louis-mountbatten/)

নিঃশুল্ক স্বাস্থ্য
পরীক্ষা শিবির

১ ও ২ - খরমাডাঙা

৩ - ব্রহ্মপুর

VISHVA HINDU VARTA
Phone : 2555-3588/4231

15th December,2021
Price : Rs. 10 Only

Post Regd. No. : KOLRMS/98/2019-21
RNI No. : 30136/1976

Donate Blood when Alive, Pledge for Organ Donation after Brain Death (Heart,Lung,Kidney,Eyes etc. 34 vital organs can save life of 34 persons),Pledge for **Donation of Eyes** after Death.

Your such Donation/Pledge for Donation when alive will make you Immortal after Death

SARAT SARKAR TRUST

5/1, Sashi Bhushan Ghosh Lane, Shibpur, Howrah - 711102
Contact- 8900128561,9433048284,9830280581,9836622095

NB: Donate Generously for our Various Social Works.Your Donation to our Trust is Exempted under Sec.80G(5)(VI) of Income Tax Act.

জীবনকালে রক্তদান, মস্তিষ্কের মৃত্যুর (ব্রেন ডেথ) পর অঙ্গদান (হার্ট,লাং, কিডনি,চোখ প্রভৃতি অমূল্য অঙ্গ ও টিস্যু সর্বাধিক ৫৯ জন মানুষকে), মৃত্যুর পর চক্ষুদান করে অমরত্ব লাভ করুন।

আপনার জীবনকালে এই দান/মহাদানের অঙ্গীকার মৃত্যুর পর আপনাকে অমরত্ব দেবে।

শরৎ সরকার ট্রাস্ট

৫/১, শশীভূষণ ঘোষ লেন, শিবপুর, হাওড়া - ৭১১১০২
যোগাযোগ- ৮৯০০১২৮৫৬১, ৯২৩১১৭১১৩৩, ৮৯১০৬২৭৯৩৮, ৯৮৮৩১৯৪৮৭২

বি.দ্র. - আমাদের অন্যান্য সমাজসেবার কাজে মুক্ত হস্তে অর্থসাহায্য করুন। আপনার দান আয়কর আইনের ৮০জি(৫)(VI) ধারায় আয়কর মুক্ত হবে।

Publisher,Printer,Editor Sri Pitarun Mukherjee on behalf of Vishva Hindu Parishad,Dakshin Banga,
33,Bhupen Bose Avenue, P.S.-Shyampukur, Kolkata-700004 and
Printed at Seva Mudran - 43,Kailash Bose St.,Simla,Machuabazar, Kolkata-700006
Website : www.vhpbengal.org; www.vhp.org/publication • E-mail : vishvahindu1964@gmail.com, vishvahinduvarta@yahoo.in